সদামামার অভিযান

শ্রীসুজিত কুমার নাগ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
[illegible]

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৫৮

প্রচ্ছদ এঁকেছেন : শ্রীসব্যসাচী দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা—৯

॥ এক ॥

অদ্ভুত খেয়ালী ছিলেন সদানন্দ মামা। দিন নেই, রাত নেই শুধু বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। কি যে করতেন, আর কি সব বই পড়তেন তা আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না।

তবুও এটা বুঝতে আমাদের বেশী দেরী হত না যে সদানন্দ মামা ছিলেন মস্ত বড় বিদ্বান আর খুব খেয়ালী। ধারণাটা কি করে হল সেটাই বলি।

আমরা যেখানে বাস করি, সেটা নিতান্তই একটা গ্রাম। গ্রামের সংগে সহরের কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। খোলা মেলা চমৎকার জায়গা। অবাধ খুশীর ফোয়ারা মাঠে-মাঠে। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে নীলাকাশ, আর লাল মাটির রাঙা পথ।

আমরা যারা নিতান্তই ডানপিটে আর ছন্নছাড়া ছিলাম, তারা সবাই মিলে একটা ঝোঁকের মাথায় দল তৈরী করেছিলাম।

দলটা কিসের ?

বলা নিষ্প্রয়োজন, খেলার। আর যে সে খেলা নয়—একেবারে ফুটবল।

পাড়ার সাথে যাদের খুব মিতালী, তারা 'ডানপিটের আসর' বলে নাম দিয়েছিল আমাদের সংঘকে। আর আমরা তাতেই খুশী ছিলাম।

এইতো সেদিনের কথা। পাশের গাঁয়ের সেরা-সেরা একদল খেলোয়াড়দের সংগে যখন জিতে ফিরছিলাম তখন পাড়ার প্রায় ছেলেদের মুখেই হাসির চেয়ে কান্নাটাই যেন বেশী করে চোখে দেখা দিয়েছিল।

যাকগে সে সব কথা। 'ডানপিটের আসর' আর একটা কাজেও সব সময় ব্রতী ছিল। সেটা হচ্ছে নানান হুজুগের মধ্যে সময় কাটানো।

কথায় কথায় আমার বন্ধু রজত একদিন আমাকে বললে, 'জানিস দিলীপ, আমার মামা কলকাতা থেকে মস্ত বড় একটা তলোয়ার এনেছেন। আর সে তলোয়ার যার তার নয়, সে মোগল আমলের নবাবদের।'

কথাটা শুনে আমার প্রায় হাসি এসেছিল। কেন না মোগল আমলের কথা শুনে, তারপর রজতের মামার কথায়।

আমার মুখের প্রসন্নতা দেখে রজত বললে, 'সদামামাকে তুই চিনবি না? মস্ত বড় বিদ্বান লোক। আমি একদিন আলাপ করিয়ে দেব।'

আমি কোন কথার জবাব দিইনি। কিন্তু এ খবরটা যখন আমাদের দলের সবাই পেয়ে গেল, তখন রজতকে আমরা সবাই বলে বসলাম, 'চল তোর মামাকে দেখে আসি।'

আগ্রহটা আমার কম ছিল না। সদানন্দ মামাকে যতটা না দেখার উৎসাহ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ সেই নবাব আমলের তলোয়ারটা।

যথাসময়েই সদানন্দ মামার কাছে আমরা সবাই গিয়ে হাজির হলাম।

সদামামা তখন একটা খাতায় কি যেন লিখছিলেন। একপাল ছেলেদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি খাতাটা লুকিয়ে রেখে রজতকে বললেন, 'কিরে কি চাই? হঠাৎ তোরা সবাই দল বেঁধে?'



রজত হাসি মুখে বললে, 'মামা এরা সবাই আমার বন্ধু। দিলীপ, কানাই, পিণ্টু, সমীর আমরা সবাই এক সঙ্গে পড়ি।'

সদানন্দ মামা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'হঠাৎ কি মনে করে আমার এই ঘরে এসেছো? কলকাতা থেকে পালিয়ে এই গ্রামে এসেছি নিরিবিলি থাকতে। সে ভারি মজার ইতিহাস।'

এই বলে সদামামা থামলেন। তারপর চশমাটাকে খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। লক্ষ্য করলাম, তাঁর বাঁ চোখের কোণে একটা কাটা দাগ।

রঞ্জত বললে, 'মামা সেই নবাব আমলের তলোয়ারটা একবার দেখাওনা, আর তাই দেখবার জন্যেই এরা এসেছে।'

সদামামা প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, 'তোর সাহস তো বড় কম নয়? কিন্তু—।'

আমি বলে উঠলাম, 'কিন্তু কি মামা? আমাদের দেখাতে আপনার আপত্তি আছে নাকি?'

সদামামা হেসে বললেন, 'না তা ঠিক নয়! সে তলোয়ার যখন তখন দেখানো যাবে না।'

দিলীপ বললে, 'কেন মামা?'

সদামামা বললেন, 'এই তলোয়ার আমি যার কাছ থেকে পেয়েছি তিনি হচ্ছেন এক ছদ্মবেশধারী মহাপুরুষ।'

কানাই আর পিণ্টু বললে, 'তাতে কি হয়েছে?'

সদামামা বললেন, 'তোমরা ছেলে মানুষ, পৃথিবীতে কত রকমের অলৌকিক আর রহস্যময় ঘটনা আছে ও ঘটছে তার খবর তোমরা রাখনা, কিন্তু আমি—'বলতে বলতে সদামামা অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু আমি ইতিহাসের পাতাগুলি পড়তে পড়তে তারই সন্ধানে কতদিন ছুটে গিয়েছি দুর্গম গিরি অরণ্যে, কত দেশে বিদেশে। যাক তলোয়ার দেখতে চাও অন্য একদিন এসো।'

আমাদের মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেলো। সদামামার এই অদ্ভুত আচরণে আমার মনটা ঠিক সায় দিলো না বলেই বলে ফেললাম, 'কেন মামা, আজ নয় কেন?'

সদামামা বললেন, 'রাত যখন নিঝুম হয়ে অসবে ঠিক তখন এই তলোয়ার দেখাব। দেখতে পাবে সেই মোগল যুগের জীবন্ত তলোয়ারই কেমন করে তোমাদের সামনে চলাফেরা করছে।'

এই কথা শুনে সত্যি কেমন একটা সন্দেহ হল আমার। হয় সদামামা পাগল, না হয় আমাদের কাছে তাঁর বাহাদুরী প্রকাশ করার জন্যেই এত ঢং। নইলে একটা তলোয়ার—যাত্রা থিয়েটারে কত দেখেছি। সেখানেও রাজা-মহারাজার তলোয়ার। আসলে তো সেই দোকানে কেনা বাঁকা তলোয়ার।

পিণ্টু বললে, 'রাত যখন নিঝুম, ঠিক দুটোয় কি আসতে হবে মামা ?'

আমি বললাম, 'সে কি করে হয়, রাত দুটোর সময় বাড়ী থেকে বেরুবো কি করে ?'

সব শুনে সদামামা বলনেন, 'ভয় করবে বুঝি ?'

আমি সজীব কণ্ঠে জানালাম, 'না, তা ঠিক নয়, বাড়ী থেকে যদি না আসতে দেয়।'

সদামামা বললেন, 'সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। আজ তোমরা এসো।'

নিশ্চিত হয়েই আমরা যাবার জন্য তৈরী হলাম, কিন্তু কোথা থেকে যে আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে এলো তা নিজেরাই বুঝতে পারলাম না। শুধু কি ঝড়, শুধু কি আকাশ কালো, সেই সংগে বৃষ্টি।

অগত্যা আমরা সদামামার ঘরেই রইলাম।

রজত বললে, 'বস্ তোরা, চট করে মুড়ি আর ভাজা নিয়ে আসি। যা বৃষ্টি—'

পিণ্টু বললে, 'বেশ মজা হবে।'

সদামামা হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। সদামামার চোখের দিকে তাকাতেই কাটা দাগটা আবার দেখলাম। ইতিমধ্যে মুড়ি আর ভাজা এসেছে।

আমরা খেতে সুরু করলাম।

সদামামা এতক্ষণ কি একটা বই পড়ছিলেন, হঠাৎ বইটা বন্ধ করে দিয়েই সারা ঘরে পায়চারী করতে করতে আপন মনে বলতে লাগলেন 'কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না সেই সব কথা। একদিন এমনি এক ঝড় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমি চলেছিলাম সেই এক রহস্যময় জগতে। সেই কালাপাহাড়, সেই নাদিরশা, সেই চেঙ্গিস—'

বলতে বলতে থেমে গেলেন সদামামা।

হঠাৎ রজত বললে, 'আপনার বাঁ চোখের কোণটা কাটা কেন?—'

সদামামা বললেন, 'সে অনেক কথা। একদিনে বলে শেষ করা যাবে না।'

আমরা সবাই আবদারের সুরে বললাম, 'বলুন না, আমরা শুনবো। তাছাড়া কখন যে বৃষ্টি থামবে তারও ঠিক নেই।'

সত্যি কথা বলতে কি এমন বেয়াড়া আর বিশ্রী বৃষ্টি এর আগে আমরা দেখিনি। শুধু কি বৃষ্টি! সেই সংগে আকাশ ফাটিয়ে মেঘের গর্জন, বাজ পড়ছে, বিদ্যুত চমকাচ্ছে। এমন সময় গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে?

সদামামা বললেন, 'নিতান্তই যখন ছাড়বে না, তখন শোন।'

এই বলে সদামামা চুপ করে গেলেন। গল্প শোনার লোভে আমরা সবাই একেবারে চুপ করে গেলাম!

ঠিক সেই সময় রজতের মা এসে বললেন, 'এই বর্ষায় খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে সবাই বাড়ী যেও।'

খাওয়ার কথা শুনে আর সদামামার গল্প এই তুটো যখন একসঙ্গে আমরা পাচ্ছি তখন আমাদের আর বাড়ী ফেরার দিকে মন নেই।

সদামামা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, হয়ত তাঁর হারিয়ে যাওয়া মালার স্মৃতিগুলো একসঙ্গে চয়ন করে নিতে তাঁর সময় লাগছে।

কিন্তু সত্যি সত্যি সদামামা স্থরু করলেন, 'সে আজ কতদিনের কথা। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম বেজায় সাহসী। এই জন্যে আমার বন্ধুরা প্রায়ই আমায় বলতো, সদা তুই তো খুব সাহসী, পারিস যেতে ঐ জীর্ণ ভগ্নস্তূপ মন্দিরে ?

আমরা যে গ্রামে বাস করতাম, সেটা বাংলাদেশ নয়।

বিহারের এক অখ্যাত গ্রাম—নাম তার ডাঙ্গোয়াপোখী। যেদিকে তাকাও শুধু ধূ ধূ করা পাহাড় আর গাছ, কালো আকাশ আর লাল মাটি। লোকজন নেই।

আমাদের ডাঙ্গোয়াপোখী থেকে প্রায় ন' মাইল দূরে বড় বিলের কাছে সেই জীর্ণ মন্দির। বন্ধুদের কথা শুনে আমি বলেছিলাম—পারব, নিশ্চয়ই পারব।

আমার কথা শুনে আমার বন্ধুরা আমাকে বিদ্রুপ করে বলতো—তা হলেই হয়েছে সদা।

ছেলেবেলা থেকেই আমার ইতিহাসের প্রতি প্রবল ঝোঁক। আর সেই ইতিহাসের সাধনাতেই এই জীবন গড়ে তুলেছি।'

সদামামা এবার চুপ করলেন, তারপর বাঁ চোখের কোণের কাটা দাগটাতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে চশমাটা চোখে দিলেন।

আবার বলতে স্বরু করলেন, 'সত্যি সত্যি একদিন আমি সেই জীর্ণ মন্দিরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তৈরী হলাম।

বন্ধুদের বললাম, তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর। আমি এই রাতেই রওনা হয়ে কাল সকালে ফিরব। আর যদি না ফিরি তা হলে ভেবো সদা নেই।'

আমি এই ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'জীর্ণ মন্দিরে যাবার হঠাৎ সখ হল কেন আপনার ?'

মামা আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'কেন সখ হল ? ওরে বোকারদল, জীবনে যদি কিছু না জানতে পারলাম তাহলে এ জীবনের কি দাম রে ?'

পিণ্টু বললে, 'তারপর সদামামা, বন্ধুদের ত বললেন অপেক্ষা করতে, আপনি কি করলেন ?'

সদামামা বললেন, 'আমি, হ্যাঁ, আমি একাই সেই জল-ঝড় দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলাম।

সেদিন আকাশে ঠিক ছিল এমনি এক ঝড়ের সংকেত। ডাঙ্গোয়াপোষা থেকে লাইনের ধার দিয়ে দুর্গম রহস্যময় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমি চলতে স্বরু করলাম।

চলেছি তো চলেছি, কোন্ দিকে যাচ্ছি, কি ভাবে যাচ্ছি তার কোন খেয়াল নেই।

পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি ডাঙ্গোয়াপোষীর লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে এসেছি।

জীর্ণ ভগ্নস্তূপ মন্দির, সেই বড়বিল এখনও অনেক দূরে। আকাশে ঝড় বৃষ্টি। রাত প্রায় ঘন হয়ে এসেছে।

দুর্গম গহন অরণ্যরাজি ছেড়ে, গভীর পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পাইনের বন, দুধারে নদী-নালাকে অতিক্রম করে এসেছি।

হঠাৎ আমার সারা শরীরে কিসের একটা দুর্জয় শক্তি ফিরে এল যেন। চেয়ে দেখলাম, দূরে ঐ পাহাড়ের ওপরে একটা ভগ্ন মন্দির। না মন্দির নয়, একটা বাড়ী! মনটা কেমন যেন হয়ে গেলো।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। আবার বৃষ্টি, আবার ঝড়, আবার আকাশ লাল।

অগত্যা সেই পাহাড় বেয়ে সেই বাড়ীটার কাছে এলাম।

কার বাড়ী জানি না? আমি কড়া নাড়তে শুরু করলাম।

॥ দুই ॥

তারপর সদা মামা আবার চুপ করে রইলেন। আমরা যারা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সদামামার গল্প শুনছিলাম, মনে হল গল্পটা মাঝপথে হারিয়ে গিয়েছে। তা নয়তো কি ?

এর আগের ঘটনাগুলো পরপর সাজাতে গিয়ে সত্যই দেখতে পেলাম, কোন এক খেয়ালে সদামামা কৌতূহলের বশে দুর্গম রহস্যময় পাহাড়কে ডিঙ্গিয়ে হঠাৎ মাঝপথে দুর্যোগের রাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন আর এক গৃহাঙ্গণে। ব্যাস, এইটুকুই।

তারপর ?

তারপর সদামামা তাঁর আয়ত-ঘন নিবিড় চোখের তারায় একটা অদ্ভুত হাসি নিয়ে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন।

সদামামা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'সেই জল, ঝড়, দুর্য্যোগের রাতে সে বাড়ীতে গিয়ে আমি কড়া নাড়লাম, তার খানিক পরেই ছুটে এলো একটি লোক।

যেমনি তার গায়ের রং আর তেমনি তার বিশ্রি চেহারা।

জাতিতে আদিবাসী, নাম তার কালী পাহাড়ী। আমাকে এত রাতে এই অবস্থায় আসতে দেখে বললে 'কি চাই তোমার ?'

আমি সহজ ভাবেই বলেছিলাম, 'বাইরে যা বৃষ্টি-ঝড়। রাতের মত একটু আশ্রয় চাই।'

কালী পাহাড়ী আমাকে নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলো।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই জনহীন প্রান্তরে, যেখানে লোকালয়ের কোন চিহ্ন নেই, কী করে সেইখানে বাড়ী তৈরী হয়েছে ?

আরও আশ্চর্য হলাম, যখন দেখলাম যে একটা ঘরে আলো জ্বলছে, আর সেই ঘরের আলোয় একজন পায়চারী করতে করতে নিজের মনেই বলছে, সব শেষ হয়ে গেল।

আমি কৌতুহলের বশেই কালী পাহাড়ীকে বললাম, কি ব্যাপার ?

তার উত্তরে কালী আমায় বললে, সারারাত বাবু জেগেই থাকেন, একটুও ঘুমতে চান না। আর এই বাড়ীতে কালী পাহাড়ী আর বাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

কথাটা শুনে মনটা যেন কী রকম হয়ে গেল! মনে মনে ভাবলাম, 'সেই ভগ্নস্তূপ জীর্ণ মন্দিরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এসে হয়তো ভালো করিনি, আর কেনই বা এলাম ?'

গল্পটা বেশ জমে উঠেছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী জমিয়ে দিয়েছে ঘন আকাশের কোলে ঝড়ের মাতামাতি।

একটা অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে যখন গল্পটা সুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময়ই আমাদের মধ্যে পিণ্টু বলে উঠলো, বড্ডো খিদে পেয়েছে।

কথাটা মামার কানে গিয়েছিল হয়ত—হয়ত বা যায়নি। কিন্তু সদামামা খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলেন।

তারপর আবার কি মনে করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা যারা আজ এই গল্প শুনতে এসেছো, মনে রেখো এটা কিন্তু গল্প নয়। আমার জীবনের সত্যিকারের ঘটনা। অনেকদিনের ফেলা আসা ঘটনা কিনা, তাই মনে করতে সময় লাগছে। কি যেন বলছিলাম ?'

আমি সদামামাকে আগেরটুকু ধরিয়ে দিলাম।

তারপর সদামামা বলতে আরম্ভ করলেন, 'তারপর আবার কি?

কালী পাহাড়ী আমায় নিয়ে গেলো সেই ঘরে। ঘরে গিয়ে দেখলাম এক সৌম্যকান্তি দর্শন ভদ্রলোক। চোখে চশমা, সামনে এক বিরাট টেবিল। টেবিলের পর কি সব কাগজ ছড়ানো।

আমাকে দেখতে পেয়েই তিনি চমকে উঠলেন, যেমন মানুষে ভূত দেখলে চমকে ওঠে। চিৎকার করে উঠলেন, কে কে তুমি?

আমার কথা কালী পাহাড়ী বললে।

তখন সেই সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক প্রসন্ন হেসে বললেন, তা কি মনে করে বাবা। আজ দীর্ঘ সাত বছর ধরে বাইরের কোন লোকের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছি।

তা তুমি কেন এলে? এসেছো ভাল হয়েছে, আর তোমাকে ফিরে যেতে দেব না। এইখানেই থাকবে। ভয় কি তোমার?

এই সব কথা বলতে বলতে একটা অট্টহাস্য করে সেই ভদ্রলোক চিৎকার করে কালী পাহাড়ীকে বললেন, ওরে কালী নিয়ে আয় সেই ছিন্ন মুণ্ডু, নিয়ে আয় সেই ত্রিভুজ, নিয়ে আয় সর্বশক্তিমান মহাপুরুষকে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরেই বললাম, তার মানে? আমি কি এখানে বন্দী।

'না, না, না,' বলতে বলতে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি তোমাদের, নাম তার শ্রীনিবাস সামন্ত।

আমার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা দেখে শ্রীনিবাস বললেন, সত্যি করে বল এখানে কেন তুমি এসেছো ?

সাহস করে আমার কথা জানালাম, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বিহারের বড়বিলের সেই অবলুপ্ত জীর্ণ মন্দিরে কি আছে তাই দেখতে যাব।

আমার কথা শুনে শ্রী নিবাস সামন্ত বললেন, মূর্খ, বালক তুমি, কি করে যাবে ? এখান থেকে পায়ে হেঁটে গেলে তোমার



দীর্ঘ দিন লাগবে, পথে বিপদ। তোমাকে ওখানে যাবার গুপ্ত রাস্তা বলে দেব। কিন্তু একটা সর্তে। কেউ জানবে না, কোন দিনই তুমি বলতে পারবে না, কি করে গেলে।

আমি শ্রীনিবাস সামন্তের এই অর্থহীন কথা শুনে হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। শুধু বললাম, কি করে ?

তার উত্তরে শ্রীনিবাস সামন্ত বললেন, 'এই যে নক্‌সাটা দেখছো, তাঁর টেবিল থেকে একটা বিরাট মানচিত্র বার করে

দেখালেন, তারপর বললেন, 'এই যে সরু একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, যেটা ডাঙ্গোয়াপোষীর বাঁদিক দিয়ে গেলে পাবে উল্টো পথ, যেখানে শুধু বন, আর বন, পাহাড় আর পাহাড়। একটাও মানুষ দেখতে পাবে না।

উর্বর লাল মাটিকে ভেদ করে, জীর্ণ রুক্ষ ধূসর গিরি অরণ্য পার হয়ে তোমাকে যেতে হবে সেই বড়বিলে, হয়ত নাও যেতে পারো। কেন না প্রতি মুহূর্তে যেখানে বিপদের হাতছানি, হিংস্র প্রাণীদের যেখানে অবাধ গতি, সেখানে তুমি এক সামান্য বালক কি করে যাবে? যেতে পারবে শুধু আমার সাহায্যে।'

শ্রীনিবাস সামন্তের কথা শুনে আমার মনে সাহস এলো, আর সেই সঙ্গে মনে পড়লো আমার বন্ধুদের কথা, তারা বলেছে, সদা তুই আর ফিরতে পারবিনে।

তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ভগ্ন মন্দিরের রহস্য উদ্ধার করে ফিরে গিয়ে বিজয়ের বরমাল্য পাব এই মনে করেই শ্রীনিবাস সামন্তকে বললাম, বলুন, বলুন দয়া করে, আমায় বলে দিন কী করে আমি যাব?

আমার কথা শুনে শ্রীনিবাস সামন্ত বললেন, 'ধীরে, ধীরে সদা, ধীরে। এইতো সবে রাত হয়েছে, যখন রাত নিঝুম হয়ে আসবে, তখন আমি মন্ত্র-বলে আর সেই ছিন্নমুণ্ডু, ত্রিভুজ, আর সর্বশক্তি মহাপুরুষের কল্যাণে তোমাকে পাঠিয়ে দেব জীর্ণ মন্দিরের কাছে। না, না, ভয় নেই তোমার, তুমি নিজেও টের পাবে না কেমন করে গেলে।

আমার আর করার কিছু ছিল না। বাইরে ভীষণ দুর্যোগ, যে এখান থেকে চলে যাবো। আর তা ছাড়া এই গভীর

রাতেই বা কোথায় যাবো। তার চেয়ে শ্রীনিবাস সামন্তের মন্ত্র বলেই যদি বা সেই ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরে যেতে পারি তার চেয়ে বড় লাভ কি ?

এই পর্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে গেলেন।

গল্পের মশগুলে আর নবাবী আমলের সেই তলোয়ারটা দেখার লোভে আমাদের ক্ষিদেটুকু পর্যন্ত লোপ হয়ে গেছে। আর গল্পটাই যে এমনভাবে সুরু হয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ বাড়ী যাব না, এমন কি সদামামার সেই রাত যখন নিঝুম হয়ে আসবে তখনও।

অগত্যা সদামামা খানিক থেমে আবার কোন ভূমিকা না করেই উদার গম্ভীর কণ্ঠে বলতে সুরু করলেন, 'তারপর তিনি আমায় বড়বিলের সেই জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের ইতিবৃত্তিকা শোনাতে লাগলেন। আমি আগ্রহভরে শুনতে লাগলাম।

শ্রীনিবাস সামন্ত বললেন, সেই জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে হাজার হাজার বছরের গুপ্তধন আর সোনার তাল মরচে পড়ে আছে। কেউ যেতে সাহস করে না। কেন না একবার মন্দিরের মধ্যে কেউ গেলে আর ফিরে আসবে না, তার দ্বার চির রুদ্ধ। এইজন্যেই আজ সাত বছর ধরে আমি এইখানে সেই বিচিত্র মন্দিরের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বসে রয়েছি।

এই সব কথা বলতে বলতে শ্রীনিবাস সামন্ত আমায় আরও জানালেন, সেই রহস্যময় মন্দিরে যাবার অধিকার তারই আছে যে জানে তন্ত্রের সাধনা।

আমি শ্রীনিবাস সামন্তের কথা শুনে প্রায় চমকে উঠেছিলাম, কেন না আমার তন্ত্র-মন্ত্রের কোন জ্ঞানও নেই। আমার সমস্ত

অন্তর যেন সহসা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এক অজানা, অচেনা রহস্য মন্দিরের জীর্ণ ক্ষয়ে যাওয়া ইতিহাসকে আমি আবিষ্কার করতে পারব বলে।

আর তারই জন্যে শ্রীনিবাস সামন্তের কাছে বার বার অনুরোধ করলাম, বলে দিন কেমন করে যেতে পারি বড়বিলের সেই ভগ্নস্তূপ মন্দিরে !

আমার আকুতিমাখা মুখখানা দেখে তাঁর দয়া হল, তিনি বললেন, এই দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই হবে তোমার শুভযাত্রা ! ভয় নেই।

এই বলে একটা বিকট অট্টহাস্য করে কালী পাহাড়ীকে ডাকলেন। তারপর এক দুর্বোধ্য সংকেতে আমাকে তাঁর সামনে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি তাঁকে স্পর্শ করলাম।

আর আশ্চর্য, সেইক্ষণে আমি যেন দেখতে পেলাম, এই শ্রীনিবাস সামন্ত যেন এক বিকট ভয়াল মুখোসধারী কোন যমদূত ! তাঁর হাতের মধ্যে এক ভয়ানক ত্রিশূল, আর এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় তার যেন কালনাগিনীর উদ্যত ফণা, আর সেই ঘরে, যে ঘরে চেয়ার টেবিল, আর যা কিছু ছিল সমস্ত সরে গিয়ে অগণিত নরমিছিল।

সব মৃত ম্লান।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপছিল, তবুও সাহস করে বললাম, একি প্রহেলিকা ? কে আপনি ? আমায় ছেড়ে দিন ! চাইনে সেই রহস্যময় মন্দিরের গুপ্তধন, চাইনে সোনার তাল !

তিনি কোন কথার জবাব দিলেন না।

একবার লক্ষ্য করলাম কালী পাহাড়ীর মুখের দিকে। তাকে যেন চেনাই যায় না। এ যেন সে নয়, হঠাৎ তার মুখের কাছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরুল, শব্দটা ঠিক একটা বিড়াল ছানার মত!

আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো, রাতের ঘন অন্ধকার আরো জমে উঠেছে, বাইরের জল ঝড় থেমে গিয়েছে, সারা ঘরে একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্য করলাম শ্রীনিবাস সামন্তকে। তিনি আমার শিয়রে বসে হাসছেন।

আমার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় পেয়েছিলে? না, না, ও কিছু নয়, এক মন্ত্র বলে তোমাকে আমার আয়ত্বে এনেছিলাম। তুমি যা সব দেখেছো সে সব তোমার মনের ভুল, তুমি পারবে। হ্যাঁ এইবার তোমাকে শেষ শক্তিবান দিতে হবে, যার বলে একটুও কষ্ট হবে না তোমার, তুমি এখান থেকেই সোজা চলে যাবে সেই জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপে।

এইবার সত্যি কথা বলতে যেন মনে হলো, শ্রীনিবাস সামন্ত মানুষ নয় দেবতা! নইলে তাঁর এত শক্তি।

বললাম, বেশ রাজি, দিন আপনার সেই মহামন্ত্র!

আমার কথা শুনে বললেন, এই তো সময়, রাত এখন নিঝুম, কেউ জানবে না, তোমাকে আমি কোথায় পাঠাব? বলতে বলতে একটা মড়ার মাথা আমার সামনে এনে ধরলেন, তারপর বললেন, এই নরমুণ্ড এনেছি কোথা থেকে জানো?

জানো না বুঝি! এনেছি সেই মিশর দেশ থেকে, যখন আমি ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম এই ভারতবর্ষ থেকে। কেন গিয়েছিলাম জানো?

গিয়েছিলাম এই নরমুণ্ডের সাহায্যেই। আমি এই নরমুণ্ডের সাহায্যেই বিশ্বজয় করব। এসো বৎস, ভয় কি ?

আমি চুপ করে রইলাম, চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে তোমরাই বল ?'



আমরা যারা গল্প শুনছিলাম চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, কেন না এমন আজগুবী গল্প কে লিখেছে বা শুনেছে তা আমাদের জানা নেই।

আমরা যারা ডানপিটের আসরের সভ্য তারা হুজুগটাই ভালবাসি। তাই তো রজতের মামা সদামামার এই আজগুবী গল্পটাও হজম করছি চুপ করেই।

বাইরে এতক্ষণ বৃষ্টি যতটুকু ছিল তা থেমে গিয়েছে, ঝড়ের যে আভাস ছিল তাও নেই। কখন যে বৃষ্টি এলো, আর কখন যে থেমে গেলো তা কেউই টের পেলাম না।

খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজার ভোজন 'পর্ব শেষ হলেই আমরা চলে যাব।

কিন্তু সদামামা ?

সদামামা আবার সুরু করলেন, 'আমার জীবনের ফেলে আসা ঘটনা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। যাই হোক, তারপর কি যেন বলছিলাম ? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেই মড়ার মাথাটা আমার কাছে এনে শ্রীনিবাস সামন্ত এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে আমাকে বললেন, 'শোন সদা এইবার এই মড়ার মাথাকে ছুঁয়ে তুমি শপথ কর, আমি যে মন্ত্র শোনাব. তুমি ছাড়া আর কেউ কোনদিনই জানতে পারবে না।

এ মন্ত্রের এমন গুণ যে, তোমার যখন যেখানে খুশী, যে কোন রকম বেশ ধারণ করে চলে যেতে পারবে। মিশরের পুরোহিত হিংটংএর কাছ থেকে শুনেই এ মন্ত্র আমি আয়ত্তে এনেছি।

এই বলে শ্রানিবাস সামন্ত হাত ঘড়িটাকে খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। ঘড়ির কাঁটাটাতে রাত চারটে। চোখে আমার ঘুম জড়িয়ে এসেছে ! কি করব কিছুই ভেবে পেলাম না।

হঠাৎ শ্রানিবাস সামন্ত একটা শিশি থেকে কি একটা গ্লাসে ঢাললেন, তারপর টেবিলের পর মাথা রেখে চোখ বুজলেন। আমি অসহায়ের মত চারিদিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঠিক সেই সময় কালী পাহাড়ী এসে বললে, কর্তা ঘুমিয়েছে। আর জাগবে না। আবার ভোর হলেই জাগবেন।

তার মানে ?

কালী পাহাড়ী যা বললে তার মানে, সাত বছর আগে মাথার গোলমালের জন্য শ্রানিবাস সামন্ত এখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, কালী পাহাড়ীরও কেউ নেই, এই বিহারে এসেই দূর এক ঘন নিবিড় পাহাড় ঘেরা কুটীরে আশ্রয় নিয়েছে শ্রীনিবাস সামন্তের সঙ্গে।

কালী পাহাড়ীর সমস্ত কথা শোনার পর আমার সমস্ত ঘটনাটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেলো, টেবিলের উপর একটা বিরাট খাতা, আর সেই খাতার ওপর স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে শ্রীনিবাস সামন্ত, তন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী।

কি আশ্চর্য! একটা নক্সাও দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে যে বড়বিলের মন্দিরে যাবার পথ।

শ্রীনিবাস সামন্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন! আহা বেচারা!

আমি ভোর হয়েছে দেখেই কালী পাহাড়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আবার রাস্তা ধরে সোজা চলে এলাম, আর এই রাস্তা ধরেই দুটো পথ, একটা যাবার, আর একটা ফিরে যাবার।

না ফিরে যাব না, যখন এতদূর এসেছি বড়বিলের সেই জীর্ণ মন্দিরের রহস্য আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।

আমি রাঙা মাটির পথ ধরে পথ চলা সুরু করলাম।'

একটানা অনেকক্ষণ চলার পর সদামামা থামলেন।

সত্যি কথা বলতে কি সদামামার বাঁ চোখের কাটা দাগটা দেখতে গিয়ে এই গল্পটার এমন জমাট হতে পারে এর আগে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি।

রজতের কথায় মামার নবাবী আমলের তলোয়ারটা দেখতে

আসায় এত বড় বিপত্তি ঘটতে পারে তা যদি আগে আমরা জানতাম তা হলে আসতাম কিনা সন্দেহ ছিল।

এখন মুসকিল হচ্ছে গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু উঠতেই হল যখন রজতের মা বার বার আমাদের খাবার জন্য ডাক পাঠালেন।

সদামামা বললেন, 'যাও খেয়ে এস, খাওয়া দাওয়ার পর বাকীটা বলা যাবে।'

অগত্যা আমাদের উঠতে হল, আর না উঠে উপায় ছিল না, ক্ষিদে যা পেয়েছিল।

।। তিন ।।

রঞ্জতের মা আমাদের সবাইকে যত্ন করেই খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেতে দিলেন। বৃষ্টির দিনে এমন ভালো লাগছিল খেতে যে তা আর বলার নয়! খাওয়া দাওয়ার পর আবার সবাই সদামামার ঘরে এলাম।

সদামামা তখন একটা সাদা কাগজের ওপর কলম দিয়ে কি যেন লিখছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়েই কাগজটিকে সরিয়ে রাখলেন। তারপর বিনা ভূমিকায় আগের ঘটনার জের টেনে বলতে সুরু করলেন!

এই অবসরে আমরা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সদামামার মুখে এক প্রসন্নতা, হয়ত গল্প আমাদের শোনাতে পারছেন ব'লেই।

সদামামা বললেন, 'শ্রীনিবাস সামন্তের পাগলামীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে কালী পাহাড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওখান থেকে চলে এলাম। এসে তো ভাবলাম, কী করব? শেষ পর্যন্ত রাঙা মাটির পথ ধরে সোজা হাঁটতে সুরু করলাম।

ডাঙ্গোয়াপোষীর সামনে একটা প্রাচীর আছে, যে প্রাচীরকে ভেদ করে আমি এসেছি এপারে।

এপারের পথের সঙ্গে আমার না আছে পরিচয়, না চিনি কাউকেই। তাছাড়া এখানে যারা যারা বাস করে তাদের মধ্যে হোজাতি, সাঁওতালী, আর আদিবাসীরাই বেশী।

আমার তো ভয়ানক অসুবিধে হল। মনে মনে নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হলো, কেন যে বড়বিলের সেই ভগ্ন মন্দিরের রহস্য উদ্ধার করতে এতদূরে এলাম।

কোথায় বড়বিল, আর কোথায় বা সেই মন্দির? এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি তো চলেছি। শেষ পর্যন্ত একটা গরুর গাড়ী দেখতে পেয়ে মনে অনেকটা আশা এলো। যাকগে খানিকটা তো চড়ে যেতে পারবো।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীটাকে ডাকলাম। আরও দু'জন লোক ছিল। আমাকে নিয়ে মোট তিনজন হল। কথায় কথায় জানতে পারলাম, আজ হাটে বাজার বসবে, তারই জন্যে ওই দু'জন লোক চলেছে বাজারে জিনিস কিনতে।

বড়বিল তো অনেক দেরী, আরও অনেক দূর? ভাবলাম আমিও হাটের মধ্যে গিয়ে কয়েকটা টুকরো জিনিস কিনে নেব, এই মনে করে ওদের সংগে অবশেষে হাটেই এলাম।

তোমরা যারা হাট দেখোনি তারা তাই বুঝতে পারবে না, হাট জিনিসটা কী? এখানে কি না পাওয়া যায়? সব পাবে— যা চাইবে। এই বলে সদামামা একেবারে চুপ করে গেলেন।

আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম, সত্যি কথা বলতে সদামামার গল্পটা আর তেমন জমে উঠছে না দেখে।

পিণ্টু এইবার মুখ খুললো, বললে, 'বলুন মামা বড়বিলের, সেই মন্দিরে গিয়ে কি করলেন?'

সদামামা একগাল হেসে বললেন, 'বলছি, বলছি, তার আগে যাত্রার পর্বগুলো বলেনি। মহাভারতের মতন, আমারও অনেক পর্ব আছে।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেই হাটে তো গিয়ে বিচিত্র ধরণের লোক দেখতে পেয়ে মনটা অনেক ভাল লাগলো। নানা রকমের দোকান। হঠাৎ একটা কলের গানের আওয়াজ কানে এলো, কী ব্যাপার ? ম্যাজিক ?

আর আমায় পায় কে, ম্যাজিক দেখবার আশায়, আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিলাম।

ম্যাজিকের লোভ আমার ছেলেবেলা থেকেই, তাছাড়া আমি ম্যাজিকও জানি। সে একদিন হবে'খন।

ম্যাজিসিয়ান, তার লম্বা কালো কোটের ভিতর থেকে অনেকগুলো তাস বার করে একটা আমার হাতে দিয়ে বললে, ধর তো ভাই। এটা কি রং ?

আমি দেখলাম লাল। আশ্চর্য! লাল রংই তো আবার সাদা হয়ে গেলো। এই ভাবে রং পালটাতে পালটাতে সং সাজবার মত ঢং করে ম্যাজিসিয়ান ভোম্বল শর্মা আমাকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে।

ওখান থেকে সরে এসে, আমি একটু দূরে গিয়ে দেখতে পেলাম, এক জটাধারী সাধুকে।

এই সাধুকে ঘিরে অনেক লোক। আমি সাধুকে দেখেই তাঁর কাছে গেলাম।

এ সাধু-তো নয়, যেন জ্যান্ত দেবতা! তা নয় তো কি ? সারা গায়ে ছাই মেখে, মাথায় বিরাট জটা লাগিয়ে শ্রীসৈবাবা বসে আছেন। তাঁর দুই পাশে রয়েছে বিরাট বড় বড় দুটো ডাণ্ডা। আর সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা উনুন।

সাধুবাবা শ্রীসৈবাবা ডাণ্ডা দুটোকে হাতে তুলে তারপরে

উনুনের মধ্য দিয়ে বললেন, এখানে যারা এসেছো, তোমরা যা ভাবছো, তাই ঘটবে। কিন্তু আমার এই লোহার ডাণ্ডাতে হাত দিতে হবে, কেননা এই লোহার ডাণ্ডা আনা হয়েছে পবিত্র কাশী থেকে।



সেই আদি যুগে স্বয়ং মহাদেব যখন ত্রিশূল হাতে নিয়ে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন মা সতীকে হারিয়ে, তখনকার সময়ে সেই ত্রিশূলটার দুটো খণ্ড পড়েছিল কাশীর পবিত্র ঘাটে। আমি তারই দুটো অংশ এনেছি।

যার যা মনোবাসনা, মনের ইচ্ছা, এমন কি গুপ্তধন উদ্ধার —এই সমস্তই এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে।

সাধুবাবার এই কথা শুনে ওখান থেকে প্রায়ই লোক নিঃশব্দে সরে এসেছিল। আমি সাহস করে সেই লোহার ডাণ্ডা দুটোর মধ্যে হাত দিলাম। কি গরম লোহার ডাণ্ডা! হাত যেন ঝলসে পুড়ে যাচ্ছে।

তবুও আমাকে বড়বিলের সেই অবলুপ্ত জীর্ণ মন্দিরের রহস্যময় ঘটনা উদ্ধার করতে হবেই। শ্রীনিবাস সামন্তের নকসাখানা চুরি করে এনেছি, আর সাধুবাবার দয়া পেয়েছি। আর আমায় পায় কে ?

সাধুবাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললাম, বলে দাও বাবা দয়াময় প্রভু, কেমন করে সেই বড়বিলের অবলুপ্ত মন্দিরের রহস্য উদ্ধার করতে পারব আমি ?

শ্রীসৈবাবা আমার আকুল মিনতি শুনে বললেন, জয় হোক তোর—এই না বলে তাঁর ঝুলি থেকে একটা ছোট লাল রংএর শিশি বার করলেন।

সেই শিশিটা যখন আমার নাকের কাছে ধরলেন তখন আমার মাথা ঝাঁঝাঁ করে ঘুরতে লাগল। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। কি হল ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীসৈবাবা আমাকে মাটির মধ্যে শুইয়ে দিলেন, তারপর পকেট থেকে সযত্নে মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে তার ঝোলায় রাখলেন। আমি সব দেখলাম। প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

হেসে হেসেই শ্রীসৈবাবা বললেন, বাবা ভয় কি তোর ? আমার কৃপায় তুই নিশ্চয়ই বড়বিলে যাবি ? সেখানে কত সোনার তাল, কত মণিমুকতো পাবি ? এই সব বলতে বলতে আমার হাতে একবার লোহার ডাণ্ডাটা স্পর্শ করে খুব সযত্নে আমার হাতের আংটিটাকে খুলে নিয়ে তার ঝোলাতে তুলে রাখলেন। তারপর শ্রীসৈবাবা খুব আদর করে আমায় গাল দুটোকে টিপে ধরে বললেন যা হতভাগা, বাড়ী ফিরে যা ! এই বলামাত্রই শ্রীসৈবাবা উঠে পড়লেন।

আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম সব। হাটের মধ্যে এক প্রান্তে আমি পড়ে রয়েছি। নিঃশব্দে আমাকে এখানে রেখে আমার চোখের সামনে অদৃশ্য হলেন শ্রীসৈবাবা!

আমার অবস্থা তখন কি যে বলবার নয়। তবুও সাহস করে চিৎকার করে উঠলাম, বলে উঠলাম, আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো।

আমার চিৎকার আর সেই সঙ্গে কান্না শুনে ওখানকার কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে প্রশ্ন করলে, আর আমি যখন সগর্বে ও সবিস্তারে আমার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন কয়েকটি লোক আমাকে ধিক্কার দিয়ে বললে, যাও বাড়ী ফিরে যাও।

এইখানে কত চোর সাধু আসে তা কে জানে?

আমি আর কি করব?

আস্তে আস্তে উঠলাম।

হাতের আংটি চলে গেছে, তার জন্য দুঃখ নেই, হাতটা পুড়ে লাল হয়ে গেছে! খানিকটা ছাই তুলে নিয়ে হাতে দিলাম।

কিন্তু আমি কি ফিরে যাব?

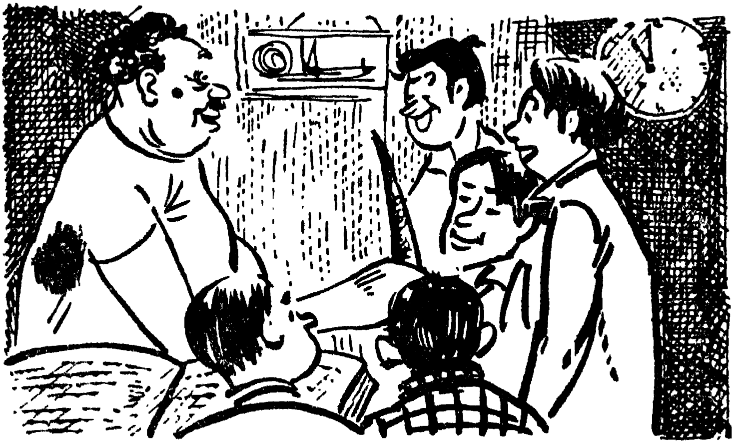
না তা হতে পারে না, আমাকে যেতেই হবে! এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। জ্ঞান হারাবার আগে যেমন হয় ঠিক তেমনি অবস্থা হলো আমার। আমার মাথা ঘুরছে কেন?

তবে কি?

শ্রীসৈবাবা আমাকে লাল শিশিতে যা ছিল তাই খাইয়েছে!

সিদ্ধি ! গাঁজা ! না, আর কিছু ! আমার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট ভাসছে শ্রীসৈবাবার সেই বিরাট বিশাল জটাধারী মূর্তিটা। আর আমি ভাবতে পারলাম না, ওখান থেকে সরে এলাম।'

এই পর্যন্ত বলে সদামামা এবার সেই লুকানো কাগজটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আবার বললেন সদামামা 'কতদিনকার আগের ঘটনা, যতই বলব, ততই আমার জীবনের বিচিত্র ঘটনা তোমরা জানতে পারবে।



এই যে সাদা কাগজের ওপর সব পেনসিলের দাগ দেখছো, এটা দাগ হলেও আসলে সেই বড়বিলের মন্দিরে যাবার রাস্তার নিদর্শন। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, তারপর কি হল, পেয়েছি সব মনে এসেছে।

আমি তো হাট থেকে চলে এলাম। ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচুর। হবে না, গতকাল সেই দুর্য্যোগের রাতে বন্ধুদের সংগে বাজী রেখে ও জিদের বশে বেরিয়ে পড়েছি।

তা ছাড়া শ্রীনিবাস সামন্তের ওখানেও কোন খাওয়া জোটেনি।

ক্ষিদে পাওয়াটা স্বাভাবিক! কিন্তু কি করে খাওয়া জুটবে—ভেবে কুল পেলাম না।

চলেছি, সামনে বাঁদিকের একটা ছোট্ট রাস্তায়, যেখান দিয়ে চলে গিয়েছে বিরাট এক নদী, আর এই নদীই মিশে গিয়ে সোজা বড়বিলের মন্দিরের সামনে গিয়েছে।

বড়বিলে কেউ যায় না? কেননা মন্দির বলে তো কিছু নেই, একটা স্তূপ! আর স্তূপে কি আছে তা কেউ জানে না।

আমি যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন যাবই। যতই বিপদ আসুক না কেন, আমি সদানন্দ সব সময়ই আনন্দে থাকি।

এই সব ভাবতে ভাবতে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম।

আহা! কি সুন্দর নদী, লাল জল, একটুও অন্য রং নেই তাতে।

আমি সেই লাল জল প্রাণ ভরে খেলাম। আশ্চর্য্য, সেই লাল জল খেতে খেতে অদ্ভুত শক্তি পেলাম। আর শুধু কি তাই? দেখতে পেলাম, একটা পদ্মফুল ভাসছে।

আমি পদ্মফুলটা ধরতে যাব. কিন্তু তা আর হল না।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি একটা নয়, চার চারটা গুণ্ডা গোছের লোক, মাথায় তাদের পাগড়ী, হাতে তাদের লাঠি, অগত্যা আমি তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে রইলেন।

।। চার ।।

সদামামার গল্পটা আবার জমে উঠেছে, কিন্তু একটা মুসকিল হয়েছে আসল জায়গায় এখনও আসতে পারেনি সদামামা।

পরপর ঘটনার ছবিগুলো মিলিয়ে নিতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা, সদামামা শ্রীনিবাস সামন্তের পাগলামীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পর, শ্রীসৈবাবার কাছে সর্বস্ব খুইয়ে, একেবারে নিঃস্ব হয়ে আবার এগিয়ে চলেছেন সেই অজানা অচেনা অদেখা বড়বিলের জীর্ণ ভগ্নস্তূপ মন্দিরের দিকেই।

ব্যস্ এইটুকুই।

তারপর ?

তারপর সদামামা আগের ঘটনার জের টেনে নিয়ে বলতে সুরু করলেন, 'পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি একজন নয় চার চারজন গুণ্ডা গোছের লোক। হাতে তাদের লাঠি আর মাথায় তাদের পাগড়ী।

আমি তো দেখেই অবাক। নিশ্চিত মনে লাল নদীর জল খেতে গিয়ে একটা পদ্ম ফুল ধরতে গিয়ে এই বিপদ। কি জানি কে তারা ? আর কেনই বা আমার কাছে এসেছে।

আমি সহজ কণ্ঠে জানালাম, কি চাই ?

ওদের মধ্যে যে বড়, আর লম্বা যার নাম লম্বোদর, সে বললে, সেলাম তোমাকে।

ওদের মধ্যে আর একজন যে সব চেয়ে ছোট আর যার নাম

বৃকোদর, আর তার বলার কি ভঙ্গী ? সে বললে, আমরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাব আমাদের রাজার কাছে।



আসলে কি জানো, এই যে লাল জল দেখছো, আর ঐ যে বিরাট মাঠ দেখছো, আর ঐ যে দূরে বড় বাড়ীটা দেখছো সবই আমাদের রাজার।

আর এই সীমানায় যে আসবে তাকেই আমরা ধরে নিয়ে যাব। আমার কাছে বৃকোদর এই কথা বললে।

আর লম্বোদর তার লম্বা লম্বা পা ফেলে বাকী দুজনকে যাদের নাম মহাবীর আর অতিবীর তাদের হুকুম দিলে আমায় ধরে নিয়ে আসতে।

আর সেই শোনামাত্র মহাবীর আর অতিবীর আমাকে তাদের আয়ত্বে ধরে নিলে। অর্থাৎ আমি তাদের বন্দী হলাম।

কি বিপদ রে বাবা ?

ভগ্নস্তূপ জীর্ণ মন্দিরের রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে কি নাজেহাল ?

লম্বোদর, বৃকোদর, মহাবীর, অতিবীর. এই চার চারটে গুণ্ডার হাত থেকে কী ভাবে পালানো যেতে পারে তার মতলব আঁটছি !

আমার একটা হাত অতিবীরের হাতে, আর একটা হাত মহাবীরের হাতে, দুই বীরের সঙ্গে হাতাহাতি করতে গেলে আমায় বুদ্ধি খাটাতে হবে। যেমন করে হোক ! এই সব ভাবতে ভাবতে আমি চলেছি।

আমি কিছু না বুঝতে পেরেই বললাম ওদের একজনকে, আমায় নিয়ে গিয়ে কি লাভ ? আবার ছেড়ে দেবে তো ?

আমার কথা শুনে চারজনই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

ওদের মধ্যে থেকে লম্বোদর জবাব দিলে ছেড়ে দেবে কিনা জানিনা, আমাদের ধরে নিয়ে যাবার ভার !

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি আমাকে ওরা একটা বিরাট বাড়ীতে নিয়ে এলো। বাড়ীর ফটকের সামনে মস্ত বড় একটা ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টার দুইদিকে দু'জন প্রহরী গোছের লোক।

প্রথমে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে এলো। তারপর একজন লোককে সামনে রেখে লম্বোদর চলে গেল।

আমি অসহায়ের মতন চারিদিকে তাকিয়ে রইলাম। যে ঘরটাতে আমাকে বসিয়ে রেখেছিল সে ঘরটার মধ্যে জিনিষপত্র বলতে কিছুই নেই। কেবল দেওয়ালের চারিদিকে নানাধরণের ছবি।

আর যে সে ছবি নয়, সেই মোগল যুগের আমল থেকে বর্তমান যুগের যুদ্ধ জয়ের ছবি।

আহা! এসে যেন জীবন ধন্য হয়ে গেছে আমার। জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে ধু ধু করা সীমাহীন মাঠ। আর চারিদিকে শুধু ঘন বন, আর জঙ্গল।

একটা লোকও নেই, কোথায় এলাম! এই সব ভাবছি।

হঠাৎ কানে এলো একটা বিকট আওয়াজ, যে সে আওয়াজ নয়, ঘণ্টা বাজার শব্দ। আর সেই আওয়াজের সঙ্গে জানালা দিয়ে আরও দেখলাম, অনেক অনেক সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, হো জাতির লোকেরা আসছে ছুটতে ছুটতে।

কী ব্যাপার?

তখনই আমার ঘরে বৃকোদর এসে আমাকে কোলপাঁজা করে দৌড়ে নিয়ে গেল বাইরে।

আর বাইরে এসে দেখি নানান ধরণের বিচিত্র লোকেরা, নানারকমের পোষাক পরে নাচতে সুরু করেছে। আহা! সে কি নাচ! মাদলের ঝঙ্কারে, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, হো নানা জাতির ছেলেরা নাচছে, আর আমি সেই নাচের মধ্যে নিজের পা দুটোকে চালিয়ে দিলাম।

আমি নাচতে সুরু করলাম।

নাচতে নাচতে পরিশ্রান্ত হবার পর আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। না হবার কোন কারণ নেই। একেইতো উপবাস তারপর এই নাচ। মাথার কি ঠিক আছে আমার? না মাথাই আছে? কি জানি।

এই মনে করে আবার যখন শেষ নাচ দেখতে যাব আর পারলাম না! মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তারপর আমার কি হয়েছিল মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি একা শুয়ে আছি। আর আমার হাত পা দুটোকে খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

যন্ত্রণায় আমি ছটপট্ করতে লাগলাম।

এমন সময় সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল একজন।



আমার ডাকে সে ফিরে তাকাল।

সে বললে, আজ উৎসব ছিল রাজা হালুম বুড়োর জন্মদিন বলে। তা তুমি বাপু বাঙালীর ছেলে হয়ে এই ভিন দেশে নাচতে এলে কেন ?

ভয় নেই, তোমায় কালই বা আজই রাত্রে ছেড়ে দেওয়া হবে। অবশ্য তার আগে তোমার বিচার হবে।

কেন তুমি লাল নদীর জল খেতে গিয়েছিলে, আর কেনই বা পদ্মফুল ধরতে গিয়েছিলে ?

এই পর্যন্ত বলে সেই লোকটা আমার মুখের কাছে মস্ত বড় দুটো কলা এনে বললে, এই নাও।

কিন্তু আমি কি করে কলা খাব ? হাত পা যে বাঁধা, বন্দী।

সে লোকটা তখন করুণা আর দয়া দেখিয়ে কলা দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে একটা মুখে পুরলে, আর বাকীটা আমার মুখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সামান্য একটা কলার এত শক্তি পৃথিবীতে আছে তা আমার জানা ছিল না। আর কি করব ? সম্রাট শাহাজানের ঘরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আমি শুয়ে রইলাম।

এবার সদামামা থামলেন। তারপর তাঁর বাঁ চোখের কাটা দাগটাতে বারবার হাত বুলিয়ে চশমাটাকে একবার কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক, বাকীটা কাল বলব।'

কিন্তু আমরা তাতে রাজী নই। কেন না যখন সুরু হয়েছে তখন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেতে রাজী নই। এমন কি আমাদের দলের কুম্ভকর্ণ অর্থাৎ সমীর সেও নয়।

সদামামা আবার সুরু করলেন, 'জানি না রাজা হালুম বুড়ো কী বিচার করবেন ? আমায় কি ওরা ছেড়ে দেবে ? সেই অন্ধকার ঘরটিতে শুয়ে আবোল তাবোল ভাবতে লাগলাম। মনে হলো শ্রীনিবাস সামন্তকে, মনে পড়লো শ্রীসৈবাবাকে।

এই অজানা জায়গায় এক ভিনদলের হাতে আমি বন্দী ?

কি করব ? শুয়েই রইলাম। একটা কলা ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি, কি যে করি ?

হঠাৎ একটা শব্দ আমার কানে এলো, শব্দটা ঠিক একটা বাঘের ডাকের মতনই।

কি জানি হালুম বুড়ো রাজার ডাক বাঘের মতনই হয়ত হবে।

না, তা ঠিক নয় !

সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘর আলো করে কোথা থেকে ছুটে এলো এক অনিন্দ্য সুন্দর রাখাল ছেলে। কি অপূর্ব তার চেহারা। হাতে তার বাঁশী।'

আমি প্রশ্ন করলাম, কে তুমি ভাই ?

হাসতে হাসতে বাঁশী হাতে সেই রাখাল ছেলেটা বললে, আমায় চিনবে না ভাই। আমি হচ্ছি এ দেশেরই একজন গাইয়ে। কাল তোমার বিচার হবে, রাজা মশাইয়ের হুকুমে এসেছি। তোমায় গান শোনাতে হবে। এদেশে বন্দীদের প্রহার করার নিয়ম নেই, একটা গানেই তার যথেষ্ট।

এই না বলতে বলতে আমার দ্বিতীয় কথা না শুনেই সেই রাখাল ছেলেটি গান ধরলে। সেকি গান ? কোথায় লাগে তানসেন, বিসমিল্লা ! গান ত নয়, যেন অসুরের চিৎকার। গান শুনতে শুনতে আমার কান প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

একগাল হেসে বললে সেই গাইয়ে, কি গো গান ভাল লাগছে তো ?

আর আমি, ভাল না বলে উপায় নেই, একেবারে বন্দী আমি, তারপর কি মনে করে তারা যদি চিরবন্দী করেই রাখে ?

ভয়ে ভয়েই বললাম, এমন গান আমি কোন দিন শুনিনি। এই প্রথম ও শেষ তোমার গান শুনলাম।

তার মানে? বলতে বলতে সেই রাখাল ছেলেটা হাসলে, তারপর হাসতে হাসতে আমার গায়ের মধ্যে বিকট সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলো।

এমন সুন্দর সুড়সুড়ি জীবনে কেউ আমায় দেয়নি।

হাত-পা বাঁধা, তার ওপর সুড়সুড়ি, আমি একেবারে অসাড় আর একটা জড় পদার্থ হয়ে গেলাম।

আর সেই গাইয়ে ছেলেটা আমাকে তার খেলার বস্তু মনে করে, মনের মত করে আমার চোখে মুখে সারা গায়ে এপিঠ ওপিঠ করে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলো।

আর আমি কাতর স্বরে বললাম, ওগো দয়াময় আমায় বাঁচাও।

জানি না দয়াময়ের কি ইচ্ছা, হঠাৎ সেই গাইয়ে ছেলেটা বললে, আজ চলি ভাই। আবার ঘুরে আসছি। এই বলে ছেলেটা চলে গেল।

আমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছি।

কি করব না করব এই পর্যন্ত বলে সদামামা অদ্ভুত একটা হাসি দেখিয়ে আবার সুরু করলেন।

ভেবে একবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, সদা কি করবি এখন?

উত্তর এলো না।

আর তখন নিরুপায় হয়ে চোখ বুঁজে রইলাম। তারপর সত্যি সত্যি যখন আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো, তখন

দেখি কে যেন আমায় ঠেলাঠেলি করছে ? কে ? চমকে উঠলাম, দেখলাম সেই মহাবীর আর অতিবীর।

তারা বললে, ওঠো ! এই বলতেই আমার হাত-পা দুটোকে তুলে ধরে নিয়ে, প্রায় ধরাধরি করেই আমাকে নিয়ে একেবারে বাইরে এলো।

বাইরে নিয়ে আসার পর আমার হাতে পায়ের দড়ি খুলে দিয়ে বললে, তোমার শাস্তি গ্রহণ কর !

তুমি কেন লাল নদীর জল খেলেছিলে ?

আর কেনই বা পদ্মফুল ধরতে গিয়েছিলে, সত্যি করে বল ?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী, আর বাংলাদেশ ছেড়ে বিহারে এসেছো কেন ?



তুমি কে ? কি তোমার পরিচয় ?

মহাবীরের কথা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে এলো। তবুও

সাহস করে বললাম, ভুল হয়েছিল ফুল তুলতে আর জল খেতে গিয়ে।

এই বলাতেও মহাবীর যখন বললে, তোমার সব কথার মধ্যে কিছু গোপন নেইতো ?

না, না, আমি বেশ সহজেই জানালাম।

এমন সময় রাজা হালুম বুড়ো আর লম্বোদর এসে হাজির।

রাজা হালুম বুড়ো আমায় দেখে প্রসন্ন হেসে বললেন, কি নাম তোমার ? আমি আমার নাম বলাতেই, রাজা হালুম বুড়ো খুশী হয়ে আমার মুক্তির আদেশ দিলেন।

আর বললেন, রাত যখন নিঝুম হয়ে আসবে, ঠিক রাত দুটোর সময় সদানন্দকে তোমরা ঐ মাঠটার মধ্যে ফেলে দিয়ে আসবে। অবশ্য জ্ঞানে নয়, অজ্ঞান করে।

আর ঐ মাঠের মধ্যে গভীর রাতে যখন বড় বড় বাঘ আর সিংহ আসবে—তখন সদাকে ওদের উপহার দেবে। এই আদেশ জারি করে রাজা হালুম বুড়ো ওখান থেকে চলে গেলেন।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাইরের গেটটার ঘণ্টাগুলো ঢং ঢং করে সময় জানিয়ে দিলো, এখন রাত বারোটা !

আর দু'ঘণ্টা পরেই ওরা আমাকে একটা জনশূন্য মাঠে ফেলে দিয়ে আসবে।

তারপর বাঘ না হয় সিংহ আমায় গিলে খাবে।

তবে কি আমার আশা পূর্ণ হবে না ?

তবে কি বড়বিলের সেই জীর্ণ মন্দিরকে আমি দেখতে পাব না ? যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে আছে সোনার তাল ?

নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম শ্রীনিবাস সামন্তের নক্সাটা ঠিকই আছে। নিজের হাত দুটোর মধ্যে হাত দিয়ে বুলোতে লাগলাম, চোখ দিয়ে দেখলাম শ্রীসৈবাবার লোহার ডাণ্ডার দাগটা ঠিকই আছে।

তবে কি ?

আমাকে ওরা আবার সেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে এলো। অবশ্য আমার হাত পা খোলা, আমি সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলাম। কি করব ? কি ভাবে এখান থেকে পালিয়ে যাব ?

হঠাৎ ঘরের মাঝ খানটায় নজর এলো, সেই অন্ধকারের মধ্যে চিক চিক করছে একটা ছোট তরবারী।

তরবারীটাকে তুলে ধরলাম। দেখলাম, তাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'মৃত্যুবাণ'। আমি শ্রীসৈবাবাকে নমস্কার করলাম, হয়ত তাঁরই দয়ায় এ তরবারি পেয়েছি। তাড়াতাড়ি করে কোমরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম।

এই পর্যন্ত বলার পর সদামামা চুপ করলেন।

আমরাও নিশ্চুপ।

এমন সুন্দর ভাবে ঘটনাগুলো এগিয়ে চলেছে তা বলার নয় !

মামার গলা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল, তাই এক কুঁজো জল নিজেই নিয়ে নিজের মুখের মধ্যে সাবাড় করেই আমাদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন।

তারপর হাতের মধ্যে একটা তালি দিয়ে খুব গম্ভীর কণ্ঠে

সদামামা আবার বলতে সুরু করলেন, 'হঠাৎ ঘড়ির ঘণ্টায় যখন দুটো বেজে উঠল, সারা বাড়ীটাতে যেন আনন্দের রোল বেজে উঠল।

আজ হালুম বুড়ো রাজার জন্মদিন, তাই আমারও মুক্তিদিন।

সে কি বাজনা? এক সঙ্গে হাজার হাজার ঢাকী ঢুলি বাজনা বাজাতে সুরু করলো! আর সেই সঙ্গে হাজার হাজার লোক মশাল জ্বালিয়ে আনন্দে নাচতে সুরু করলো।

আমাকে অতিবীর আর মহাবীর সঙ্গে নিয়ে চললো তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

যাবার আগে রাজা হালুম বুড়ো বললেন, আজ আমার জন্মদিন বলে প্রাণে মারলাম না, অর্থাৎ নিজের হাতে। কাজেই তোমাকে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাজা হালুম বুড়ো চলে যাবার সময় সস্নেহে আমাকে একবার তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বলে রাজা হালুম বুড়ো চলে গেলেন।

এই পর্যন্ত বলার পর মামা আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, হয়ত ভুলে যাওয়া ঘটনাটাকে তুলে ধরার জন্য। তারপর আবার সুরু করলেন।

আর আমি?

দলে দলে হাজার হাজার মশাল জ্বালানো লোকদের সঙ্গে রাজবাড়ী ছেড়ে বাইরে এলাম!

বৃকোদর, লম্বোদর, মহাবীর, অতিবীরও আমার সঙ্গে চলেছে। রাজপুরী থেকে প্রায় মাঠের সীমানায় এসে গেছি। সামনেই

দেখতে পাচ্ছি সেই লাল জলের নদী। সেই নদীকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছে বড়বিলের দিকে। যেখানে আমার অভিযান।

কিন্তু এরা কখন যে একা আমায় ছেড়ে দেবে তাই বা কে জানে ?

হঠাৎ সেনাপতি লম্বোদর আমার দিকে চেয়ে বললে, সদা, এইবার তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাব, নিশ্চিন্ত মনে মাঠের মধ্যে শুয়ে থাক।

এই না বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রায় জোর করে মহাবীর আর অতিবীর চাংদোলা করে তুলে নিয়ে লম্বোদরের আদেশে ঐ অবস্থায় রইলো।

এই ফাঁকে আমার কাছে বৃকোদর এসে নাকের মধ্যে একটা ঔষধ দিলে, আর সেই ঔষধ নাকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান যেন হারিয়ে গেল।

তবুও সেই জ্ঞান হারাবার আগেই আমিও ঠিক নিজেকে সামলে নিয়ে অতিবীর আর মহাবীরের হাত থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে ছিটকে পড়লাম নীচে।

তারপর আমার আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি গভীর অন্ধকার, আর একটা ধু ধু করা মাঠের মধ্যে শুয়ে।

আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়লাম। একটা বিশ্রী আওয়াজে চমকে উঠলাম। চেয়েই দেখি, সামনে একটা সিংহ হুঙ্কার দিচ্ছে। আর আমি কোন উপায় না দেখে সেই মৃত্যুবান তরবারীটাকে ছুড়ে দিলাম সিংহের দিকে।

তারপর ? আর এ প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না আমরা।

সদামামা উত্তেজিত কণ্ঠে এবং গম্ভীরভাবে একটানা বলে চললেন।



যাদুকরের ছোঁয়ার মত অবিশ্রান্ত কথক ঠাকুরের মত সদামামা বললেন, 'তারপর সেই গভীর ঘন অন্ধকারে সেই জনশূন্য প্রান্তরে, সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে হিংস্র সিংহটাকে আমার সাবাড় করতে মোটেই সময় লাগল না।

হালুম বুড়োর ঘর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া তরবারীর সাহায্যে সিংহটাকে মারবার জন্য সেই মূল্যবান তরবারীটা ছুড়ে দিলাম। জানি না কি হবে ?

কিন্তু আশ্চর্য সিংহটার একটা ক্ষীণ আর্তনাদ যখন আমার কানে এলো, আর সাহস করে যখন এগিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি সিংহটার বুকের মধ্যে সেই মূল্যবাণ তরবারীটা বিঁধে রয়েছে।

আর বুক দিয়ে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরছে।

আনন্দে আর উল্লাসে আমার সারা অন্তর পুলকিত হয়ে উঠলো। তারপর সিংহটাকে আমি আমার দুহাত দিয়ে তুলে ধরলাম, আর ধরার সঙ্গে সঙ্গে সিংহটার বুক থেকে তরবারিটাকে বার করে নিলাম।



আমার দুই হাতে তখন লাল রক্ত জমাট বাঁধা রয়েছে।

আমি খুসী হয়ে এবং নির্ভয়েই সেই মাঠটার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম।

এতক্ষণ বলার পর সদামামা কি মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন।

তারপর সুরু করলেন, 'দেখলাম চেয়ে আকাশের দিকে প্রায় অন্ধকার কেটে গিয়ে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে।'

ভোর হবার আগের মুহূর্ত।

আমার চোখে তখন নিদ্রা দেবী ভর করছে বলে মনে হলো! কি করব খানিকখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

কি সুন্দর ঘুম !

আর সেই ঘুমের মধ্যে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

দেখলাম বড়বিলের সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে আমি যেন প্রবেশ করেছি। হাজার হাজার বছরের মরচে পড়া গুপ্তধনের মধ্যে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি।

ঠিক সেই সময়ই সুন্দর স্বপ্নটা আমার ভেঙ্গে গেল।

আমি চোখ মেলে এবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ভোর হয়ে গেছে। চারিদিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

কোথায় সেই হালুম বুড়োর রাজ্য ?

আমায় প্রায় মাঠের আর বনের মাঝখানে ওরা ফেলে দিয়ে গেছে। এখন এই মাঠ আর বন পার হলেই আবার পথ ফিরে পাব।

আমি ডাঙ্গোয়াপোষীর থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। প্রায় সীমানার কাছে এসে গিয়েছি বলে মনে হল।

নিজেকে অবসন্ন পরিশ্রান্ত মনে করছি।

এবার চলার পথ ঠিক করে নিলাম।

আমার সামনেই সিংহটা মরে পড়ে রয়েছে। সিংহটার সুন্দর চামড়া দেখে আমার ভয়ানক লোভ হল।

আর কি করব ?

সিংহটার গা থেকে খানিকটা চামড়া কেটে নিলাম। তারপর সিংহটাকে নিজেই দু'হাতে তুলে নিয়ে সামনের একটা নালার মধ্যে ফেলে দিলাম।

এরপর আমার নিজের দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম

হাতে লাল রক্তের দাগ স্পষ্ট। ভাবলাম, কেউ যদি দেখে ফেলে? হয়ত আমায় খুনী বা চোর ডাকাত মনে করে ধরে নিয়ে যাবে।

না, রক্তমাখা দেহটাকে পরিষ্কার করা দরকার। এই ভেবে আমি দ্রুতপদে হাঁটতে সুরু করলাম। খানিক হাঁটার পর মাঠ আর বন ধরে সোজা চলে এলাম রাঙা মাটির পথ ধরে।

দূরে দেখা যাচ্ছে মায়াময় গ্রাম। বড়বিলের সূচনা। আনন্দে আমার মন নেচে উঠলো, তাহলে এসেছি।

ঐ তো দেখা যাচ্ছে গ্রামের পথ আর লোকজন।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে রইলেন।

আর আমরা এই অবসরে নিজেদের দিকে নিজেরা পরস্পর তাকালাম। দেখলাম আমাদের সবাইকেই গল্পটা মন্ত্রমুগ্ধের মতন বশ করে ফেলেছে।

কানাই বললে, 'সদামামা থামলেন কেন?'

সদামামা বললেন, বলছি। তারপর মায়াময় বড়বিল গ্রামের প্রান্তে এসে পড়েছি।

সকাল বেলা।

চারিদিকে লোকজন ঘোরা-ফেরা করছে। দোকান খোলা হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি করে একটা কলের ধারে গিয়ে আমার হাতের জমাট লাল রক্তগুলোকে পরিষ্কার করতে লাগলাম।

এত জমাট আর টাট্‌কা রক্ত সহজে কি উঠতে চায়? অগত্যা লাল মাটিতে দু'হাত চটকে নিয়ে জল দিয়ে ঘসতে সুরু করলাম।

তাও কি রক্তের দাগ যায় ?

অবশেষে নিজেই কলের জল হাতের মধ্যে ভর্তি করে নিয়ে আবার মাটি দিয়ে ঘসতে স্বরু করলাম। ক্রমাগত ঘসতে ঘসতে দাগটা খানিকটা উঠে গেল।

আমি সামনের একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটা আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই চমকে উঠলাম, যেমন মানুষ্ ভূত দেখলে চমকে উঠে। কি বিশ্রি চেহারা হয়ে গেছে, মাথার চুল রুক্ষ হয়েছে।

কি করব ? তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে সরে গিয়ে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে স্বরু করলাম।

দু'ধারে ছোট ছোট মাটির ঘর আর পাতার ছাওয়া কুটীর ঘর। আর দু'ধারে চমৎকার ধানক্ষেত, পাইন বনের বিচিত্র সমারোহ। উঁচুনীচু পাহাড়। আর অগণিত ফুলের ছড়াছড়ি। বন্য যুঁই ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে। ধান বনের ক্ষেতে চাষীরা লাঙ্গল ধরেছে। প্রকৃতির অপরূপ লীলা দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

নীচ থেকে ওপরের পাহাড়টার ধারে দেখলাম একটি পাহাড়ী ছেলে বয়স সাত কি আট হবে, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তার হাতে রয়েছে একটা ছোট্ট ঝুড়ি। সে ঝুড়িটাকে মাথায় তুলে নীচের দিকে আসছে।

কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটার।

হঠাৎ দেখলাম, ছেলেটা পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি করে পাহাড়ের উপর উঠে সেই গড়ানো ছেলেটাকে ধরে ফেললাম।

ছেলেটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালাম। পাহাড়ী ছেলেটা কৃতজ্ঞতায় আমায় জড়িয়ে ধরলো।

সদামামা এই পর্যন্ত বলেছিলেন বেশ সহজেই, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সামনের খাতাটাকে খুলে নিয়ে আমাদের সামনে কি যেন লিখলেন।

তারপর খাতাটাকে বন্ধ করে ঘটনার জের টেনে নিয়ে বলতে সুরু করলেন।

আমি তার ঝুড়ি থেকে টাটকা ফল খেতে সুরু করলাম। কি সুন্দর টাটকা আপেল আর কমলা লেবু।

আমি সস্নেহে তার হাত ধরে, পাহাড়ের উপর দিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে গেলাম।

সাঁওতাল জাতির ছেলে।

রেলওয়ে খালাসির কাজ করে ছেলেটার বাবা।

নাম তার ঝমরু।

আমাকে দেখতে পেয়ে বললে, বাবু দয়া করে যখন এসেছেন, একটু বসুন।

আমি তার কথামত তার বাড়ীর বারান্দায় মাটিতে বসে রইলাম। খানিক পরেই ঝমরু একটা থালায় করে অনেকগুলো মুড়ি আর বাতাসা আমাকে খেতে দিলো। আর সেই সঙ্গে চমৎকার এক ঘটি পরিষ্কার ঝরণার জলও খেতে দিলো।

ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় আমার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল। সাঁওতালীদের সেবা ও যত্নে আমার প্রাণে নতুন বল ফিরে পেলাম।

আমি আবার পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে আসতে সুরু

করলাম। আবার মাটির পথ ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটতে সুরু করলাম। বেলা গড়িয়ে প্রায় বিকেলের দিকে বড়বিলের শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলাম।

এবার শ্রীনিবাস সামন্তের নক্সাটাকে বার করলাম, নক্সার সংকেতে বুঝলাম, আরও দূরে, অর্থাৎ শেষ সীমানার পূবদিকেই সেই ভগ্নস্তূপ রয়েছে।

এখনও অনেকটা পথ!



তাছাড়া নিঝুম রাত না হলে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ একটি লোকের সংগে দেখা হয়ে গেল।

হাতে তার ছাতা। লোকটা বেজায় কালো, কিন্তু কী সুন্দর হাসি।

লোকটাকে বললাম, আজকের মত তোমার বাড়ীতে আমায় থাকতে দেবে।

লোকটা আমার কথা শুনে খানিক হেসে বললে, চলো আমার দাওয়াটা খালি রয়েছে, সেইখানেই থাকবে।

কিন্তু কেন এসেছো ?

তোমাকে দেখে বড় মায়া হচ্ছে। তোমাকে দেখে তো নতুন লোক বলে মনে হচ্ছে।

লোকটার সরলতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, তবুও যদি লোকটা শয়তান হয় সেই ভেবে, কোমরের ভিতর থেকে তরবারীটাকে বার করে নিয়ে তার দিকে দেখিয়ে বললাম, ভয় নেই বন্ধু, আমি ভগ্নস্তূপ অর্থাৎ বড়বিলের সেই রহস্যময় জীর্ণ মন্দির দেখতে এসেছি। রাত যখন নিঝুম হয়ে আসবে, তখনই যাব !

লোকটা আমার কথা শুনে খুশীমনে বললে, সাবাস ! এর আগে যারা এসেছে, তারা সবাই ফিরে গেছে। সাহস করে কেউ যেতে পারে নি।

তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে আমার সাহায্য পেতে পারো।

কী করে ? আমি প্রশ্ন করতেই লোকটা বললে, খুব সহজে।

আমি ছাড়া বড়বিলের এই ভগ্নস্তূপ আর জীর্ণ মন্দিরের ইতিহাস কেউ জানে না। আমার সঙ্গে চলে এসো, বলে লোকটা চলতে সুরু করলে।

আমিও লোকটার সংগে সংগে চলতে সুরু করলাম।

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম।

তারপর সদামামা থেমে বললেন, 'কি বিচিত্র লোক এই শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র, কি অদ্ভুত তাঁর ইতিহাস জ্ঞান। আমি দাওয়ায় বসে, নিশ্চিত মনে বড়বিলের জীর্ণ মন্দির আর ভগ্ন-স্তূপের কথা শুনতে আরম্ভ করলাম।

আর আমরা সদামামার গল্প শুনে নিজেরাই ভাবলাম সদামামা কি যাদু জানে। তা নয়তো কি? কি অদ্ভূত তাঁর বলার ভঙ্গী।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা সবাইকে চুপ করে বসে থাকবার নির্দেশ দিয়ে ঘর থেকে একবার বাইরে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

সদামামা ঘর থেকে বাইরে গেলেন।

কেন গেলেন তা আমরা জানি না। সদামামার নিজের জীবনের বিস্ময়কর ঘটনা শুনতে শুনতে আমরা যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছি।

আমাদের মধ্যে থেকে কানাই বললে, 'সদামামা যা বললে আমার মনে হয় সব মিথ্যে।'

কানাইয়ের কথাটাকে প্রতিবাদ করে বললে রজত, 'কখনোই না। সেই নবাবী আমলের তলোয়ারটা যখন দেখতে পাবি, তখন তোরা অবাক হয়ে যাবি।'

আমি কোন কথার প্রতিবাদ করলাম না। কেননা গল্প শুনতে এসেছি, এর মধ্যে সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার মত মন আমার নেই।

একটু পরেই সদামামা এলেন হাসি হাসি মুখে।

এসেই বললেন, 'খাওয়ার পাট চুকিয়ে এলাম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাকীটুকু বলা যাবে।'

এই বলে সদামামা পকেট থেকে একটা পান বার করে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললেন, 'হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছি—সেই নির্জন জনশূন্য প্রান্তরে আমার জীবনে আরেকটি আশ্চর্য অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল।'

'কি রকম?' প্রশ্নটা আমিই করলাম।

সদামামা একগাল হেসে বললেন, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে

আছে—রাজা হালুম বুড়ো যখন আমাকে তার রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়ে শাস্তি স্বরূপ আমাকে পাঠিয়ে দিলে একটা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে—সেই গভীর ঘন অন্ধকারে, ঠিক রাত প্রায় দুটোর সময়।

আমি কী করব নিজেই ঠিক করতে পারলাম না।

একদিকে সারাদিনের নির্জলা উপবাস আর একদিকে আমার অদেখা অচেনা বড়বিলের জীর্ণ মন্দিরের হদিশ না পাওয়ার বেদনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখা।

কী করব ?

অবশ্য এ ঘটনাটা সিংহটা অসবার আগেই, তাকে খতম করার আগের ঘটনা।

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, রাজা হালুম বুড়োর চার চার জন বড় বড় পালোয়ানরা আমাকে নিয়ে এসেছিল সেই জনশূন্য নির্জন গভীর ঘন অন্ধকারে।

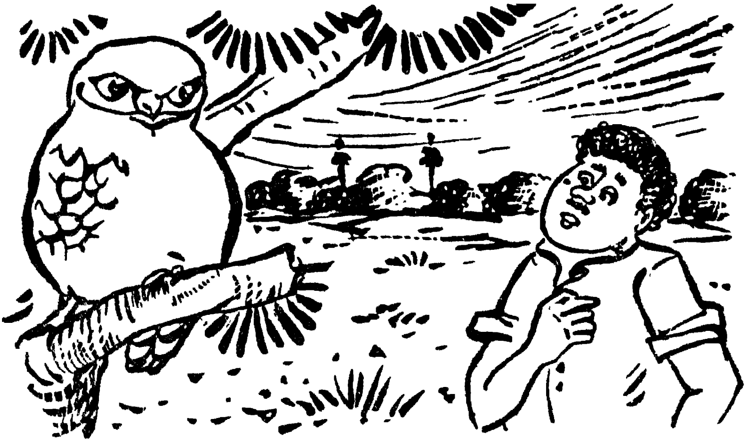
আজও আমার বেশ মনে আছে, নিথর কালো অন্ধকারে, আমি সদানন্দ হালদার মোটেই ভয় পাইনি।

বরঞ্চ আনন্দ হয়েছিল। জীবনে এমন সুযোগ কজনের আসে ? নিশ্চিত মৃত্যু ! তাই তো, তা নয় তো কি ?

সেই গভীর ঘন অন্ধকারে ঘটনার ছবিগুলি মেলাতে লাগলাম। ভাবলাম শ্রীনিবাস সামন্তকে, আর কালী পাহাড়ীকে। তারপর ভোম্বল দাস, পরম করুণাময় শ্রীসৈবাবাকে, রাজা হালুম বুড়ো, লম্বোদর, বৃকোদর, অতিবীর আর মহাবীরকে। এমন কি সেই গাইয়ে ছেলেটাকে—যে আমাকে পরম আনন্দে সুড়সুড়ি দিয়েছিল। তার কথাও।

এই সব আবোল তাবোল ভাবছি। এমন সময় দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট পাখী, ঠিক মানুষের স্বরে আমাকে ডেকে বলছে, কিরে সদা, কি ভাবছিস ?

আমি পাখীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। পাখী আবার কথা বলে নাকি ? তাই না ভেবে—আমিও পালটা জবাব দিলাম, কে তুই পাখী ?



মিষ্টি হেসে বললে পাখীটি, আমি হীরামন পাখী। তুমি কোথায় চলেছ সদা ?

আমি গর্ব সহকারে আমার অভিযানের অভিলাষ জানালাম।

তাই না শুনে পাখীটা বিশ্রী হেসে বললে, পারবে না, তুমি ?

কেন ?

পাখীটা বললে, বলছি। পাখীটা বললে, আমি কে জানো ? আমি পাখী হলেও জাতিস্মর।

'তার আগে' এই না বলতে বলতে পাখীটা চমৎকার বাংলা ভাষায় বললে, তুমি যে বড়বিলে যাচ্ছ সেখানকার গুপ্ত মন্দিরের রহস্য একমাত্র জানে শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র।

তার সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটবেই। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।

আমি কে জানো ?

আমি হচ্ছি বৌদ্ধ ভিক্ষু সান্‌সিনের ভাই লালসিন।

আমরা দুই ভাই।

বড় ভাই সানসিন গুপ্তধন পাবার আশায় বার্মা দেশ থেকে পায়ে হেটে পালিয়ে এসেছিল।

আর আমিও চুপি চুপি তার সঙ্গে এসেছিলাম। একথা কেউ জানে না। জানবে কি করে ?

আমি এসেছিলাম সান্‌সিনের সঙ্গে সঙ্গে একথা যেই সান্‌সিন জানতে পারলে আমাকে বললে, কেন এসেছো লালসিন।

আমি তার জবাবে জানিয়েছিলাম—তোমারই মত গুপ্তধনের উদ্ধারে।

যেই না বলা সেই লোভী সান্‌সিন্‌ তার তরবারি দিয়ে আমাকে হত্যা করে বিহারে আসার পথে চক্রধরপুরের এক মন্দিরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

তারপর কতযুগ কেটে গেছে।

সেই আমি, সেই লালসিন এখন হীরামন পাখীতে রূপান্তরিত হয়েছি। এই পর্যন্ত হীরামন পাখী তার ঘটনা আমায় শোনালে।

আমি সদানন্দ, যাচাই না করা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিনা, কেননা চিরকালই আমার অনুসন্ধানীমন।

আমি হেসে বললাম, ওহে পাখা তুমি যে সেই লালসিন তার প্রমাণ কি ?

আমার কথা শুনে সেই হীরামন পাখীটা বিকট হেসে বললে, 'ওরে মূর্খ সদা, তার প্রমাণ' বলতে বলতে সেই হীরামণ পাখীটা নিমিষের মধ্যে মাটির মধ্যে গড়াতে লাগল, গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে আমার কাছেই এল।

আর আমি সেই ধরেছি, দেখতে দেখতে পাখীটা একটা বিরাট মানুষে পরিণত হল।

শুধু কি তাই ! আহা মরি কি সুন্দর তার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য ! কি সুন্দর।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে রইলেন।

আমরা যারা এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম, একেবারে বোকা বনে গেলাম। কি সুন্দর সদামামার জীবনের ঘটনা আর বলার ভঙ্গীমাটুকু পর্যন্ত। আগের ঘটনা চেপে রেখে তারপর সেই ঘটনাকে শুরু করে মাঝ পথে বলার কায়দাটুকুও সুন্দর।

পিণ্টু বললে, 'সদামামা চুপ করে রইলেন কেন ?'

আমি বললাম, 'মামা আপনার চোখে কি ঘুম এসেছে ?'

সদামামা এবার চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে হলো যেন সত্য সত্য সদামামা সেই সর্বজয়ী সদানন্দ হালদার।

তারপর বললেন, 'তারপর সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে, সেই গভীর ঘন অন্ধকারে লালসিনকে বললাম, কে তুমি দয়াময় ?'

তুমি তবে চল আমার সঙ্গে, এসো তুমি আর আমি দু'জনে মিলে বড়বিলের জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ উদ্ধার করে সানুসিনের হত্যার প্রতিশোধ নিই।

আমার কথা শুনে লালসিন অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, 'তা হয় না সদা, আমি মরে ভূত হয়ে গিয়েছি।'

হাজার বছর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সমস্যার সমাধান হত। এই না বলে লালসিন তার বেজায় লম্বা হাতখানাকে আমার মাথায় দিয়ে বললে, তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার জয় হবেই।

কিন্তু একটা সর্তে। তোমার তরবারী আছে, সেই তরবারী দিয়ে আমায় মেরে ফেলতে হবে।

ভয় নেই সদা আমি আগের রূপ ধারণ করছি। এই না বলতে বলতে সেই লালসিন আশ্চর্যভাবে আগের রূপ ধারণ করলে।

নিমিষের মধ্যে হয়ে গেলো হীরামন পাখী।

আমি তার কথামত আমার মৃত্যুবান তরবারী দিয়েই সেই হীরামন পাখীটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললাম।

আর আমায় কে পায়—আমি সর্বজয়ী সদানন্দ! আর সেই মূহুর্তেই দেখি সিংহটাকে।

সিংহটাকে মারার ও জ্ঞানদাময় মিশ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আগেই বলেছি তোমাদের, কাজেই সে ঘটনা আর নাইবা শুনলে ?

এই পর্যন্ত বলে সদামামা আবার বলতে সুরু করলেন, শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্রের বাড়ীর দাওয়ায় বসে তাঁর মুখ থেকেই বড়বিলের ভগ্নস্তূপ ও জীর্ণ মন্দিরের রহস্যজনক ঘটনা শুনতে আরম্ভ করলাম।

তাঁর পুরো কথাগুলিকে সুবিধার জন্য সংক্ষেপ করে নিয়ে তোমাদের বলছি।

'শোন—আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। সেই আদি যুগের কথা। যখনও সভ্যতার আলোর রেখা আসে নি।

সে যুগের লোকেরা থাকত বনে, খেতো ফলমূল কাঁচা মাংস। সেই যুগের একজন আদিম, যার নাম ইতমসিং।

ইতিহাসে এর নাম ইয়াসিন আলি। সেই একদিন বিহারের বড়বিলে এসে এইখানে বসবাস করলো।

শুধু কি তাই? সারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত জায়গায় ইতমসিং-এর আধিপত্য বিস্তার শুরু হলো।

আর্য্যসভ্যতার আলোক রেখার ইতমসিংএর বংশধরেরা এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করলো।

সে আজ কতদিনের ঘটনা—ইতমসিংএর বংশধর ফতেম সিং, ইতিহাসে এর নাম ফতেম আলি, খেয়ালের ঝোঁকে মাটির তলায় একটা সুরঙ্গ কেটে চমৎকর একটা মন্দির তৈরী করলেন।

মন্দির তো তৈরী হল, কিন্তু কোন দেবতার আসন সেখানে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। কেননা ফতেম আলি ছিলেন মহাপ্রাণ, সমস্ত জাতির মনেই নতুন আশা জাগাবেন বলেই এই গুপ্ত মন্দির তৈরী করলেন।

আশ্চর্য এই গুপ্ত মন্দির।

হাজার বছর পার হয়ে গিয়েছে, কেউ আবিষ্কার করতে পারলে না মন্দিরটা এখন কী অবস্থায় আছে। কেননা মাটির নীচে সুরঙ্গ কেটে এই মন্দির।

আজ কত যুগ চলে গিয়েছে, কত বিচিত্র লোকের পদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। তবু সেই গুপ্ত মন্দির সেই রকমই গুপ্ত হয়ে আছে। আর ভগ্নস্তূপের একমাত্র একখণ্ড পাথর রয়েছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে যা জানা গেছে, তা হচ্ছে এই—ক্রমশ যুগের পরিবর্তনে মোগল পাঠান, শক, হুন, তাতার আর কত বিচিত্র দল, বিচিত্র জাত এলো।

ঠিক এক সময় বর্মা দেশ থেকে পায়ে হেঁটে সান্‌সিন্‌ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু পালিয়ে এলো এই বড়বিলের মন্দিরে।

জনশ্রুতি আছে তার ভাই লালসিন্‌কে সান্‌সিন্‌ চক্রধরপুরের এক মন্দিরে হত্যা করে পালিয়ে এসেছিল। আর সঙ্গে করে নিয়ে এলো একটি স্বর্ণমূর্তি স্বয়ং বুদ্ধের।

আর নিয়ে এলো বহু বিচত্র রকমের মণি, মুক্তা, জহরৎ, পান্না, সোনার তাল।

নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলেন সানসিন্‌।

কিন্তু যখন এদেশের লোক তাঁর আসার সংবাদ পেলো, তখন সারা বর্মা দেশে খোঁজ পড়ে গেছে তাঁর।

কেননা যে মূর্তিটা চুরি করে বা সংগে করে নিয়ে এসেছেন সান্‌সিন্‌ সেটা বর্মার অশেষ মূল্যবান জাতিয় সম্পত্তি।

এ খবর যখন ফতেম আলির বংশধর এবং শেষ বংশধর রুস্তম আলির কাণে গেলো, সব কথা শুনেই তখন সে রেগে আগুন।

ধরে নিয়ে এলো সেই বার্মা থেকে আসা সান্‌সিন্‌কে। আর এনেই, তাঁকে নিয়ে গেলো সেই গুপ্ত মন্দিরে।

তারপর তাঁকে গুপ্ত মন্দিরে হত্যা করা হলো। টুকরো টুকরা করে কেটে সেই গুপ্ত মন্দিরের মধ্যে রেখে দিলো।

তারপর যুগের পরিবর্তন হয়েছে।

কোথায় সেই রুস্তম আলির বংশধর, আর তাঁদের সমস্ত ধন সম্পত্তি ?

শেষকালের যা ঘটনা, ক্রমশ মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলো।

এলো এ দেশে বিদেশী বণিকরা, এলো সাম্রাজ্যবাদী সুসভ্য ইংরেজ।

তারা এসে সারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করলো, দেখতে দেখতে কত নগর তৈরী হলো।

কিন্তু সেই বড়বিলের গুপ্ত মন্দির আর উদ্ধার হল না, এমন কি সত্যিকারের ইতিহাস কেউ জানতে পারলো না।

তারপর এলো পরিবর্তিত যুগ।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌল্লার অনুচরেরা এই বিহারের বড়বিলে এসে বিরাট এক কামান দিয়ে উড়িয়ে দিলো ভগ্নস্তূপ।

পড়ে রইল শুধু একখণ্ড পাথর। আর মাটির নীচে হয়ত এখনও গুপ্ত মন্দির আছে কিন্তু কি করে কী ভাবে তার ভিতরে যাওয়া যেতে পারে তার খোঁজ কেউ জানে না।'

এই পর্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে রইলেন।

হয়ত হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত

হয়ে উঠেছে। আর আমরাও বড়বিলের শেষ পর্যন্ত কী ঘটল —আকাশপাতাল তাই ভাইছি।

আর সদামামার বাঁ চোখের দিকটা কেন কাটা রয়েছে ?

আর সবার শেষে সেই নবাবী আমলের তলোয়ারটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

সদামামা আবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। বলতে সুরু করলেন, 'শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্রের কাছে সমস্ত ঘটনা শোনার পর আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম।

প্রসন্ন হেসে মিশ্র মশাই বললেন, সত্যি যদি তুমি যেতে চাও সদা, তবে যাও। কিন্তু যাবার পথ তো আমার জানা নেই।

কেন না একমাত্র যাবার নক্সা রয়েছে বিখ্যাত তন্ত্রবিদ শ্রীনিবাস সামন্তের কাছে। সম্প্রতি তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাঁর কাছ থেকে সেই বিচিত্র নক্সাটা পাওয়া আমাদের দুঃসাধ্য!

শ্রীজ্ঞানদা মিশ্রের এই কথা শুনে আমার প্রাণে প্রচুর বল ফিরে এলো।

তখনই বললাম, আছে, আছে, আমার কাছেই আছে। এই বলতে বলতে আমি তাঁকে সমস্ত কথা সরল মনে খুলেই বললাম।

সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাস সামন্তের বিচিত্র নক্সাখানাকে দেখালাম।

নক্সাটি দেখতে পেয়ে শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র উল্লসিত হয়ে বললে, 'সাবাস সদা, সবাস! হাজার হাজার বছর ধরে যে ঘটনা আর যে গুপ্তমন্দির লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত হয়ে রয়েছে তা তোমারই কৃপায় উদ্ধার হবে। ধন্য তুমি। ধন্য।

এই না বলে সেই পরম জ্ঞানী শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

আমি তখন নিরুপায় হয়ে বারান্দায় শুয়ে রইলাম। কোমরের মৃত্যুবান তরবারীটাকে ঠিক করে নিজের হাতের মধ্যে রেখে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘুমবার চেষ্টা করলাম।

সেই রাত দুটো যখন হবে, যখন নিঝুম হয়ে আসবে তখন আমি জেগে উঠব আর তখনই সুরু হবে আমার অভিযান।

মনে হলো শ্রীনিবাস সামন্তকে, মনে হলো শ্রীসৈবাবা, আর রাজা হালুম বুড়োকে। তাঁদেরই দয়ায় ও করুণায় আমার এ অভিযান সার্থক হয়ে উঠবে।

আর শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র, তাঁকে ভুলব কেমন করে? এই সব ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ কার স্পর্শে জেগে উঠলাম। দেখি আর কেউ নয় স্বয়ং শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র। কী আশ্চর্য, তাঁর চোখ মুখ লাল কেন? হাতে তাঁর উদ্যত একটা পিস্তলই বা কেন?

আমি তখন বোকার মতন তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। এ কে? সেই পরম জ্ঞানী শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র না শয়তান লোভী জ্ঞানদা!

তিনি আমাকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মূর্খ সদা। দে সদা তোর নক্সাখানা দে। তোর নক্সার সাহায্যেই গুপ্তধন আর গুপ্ত মন্দির উদ্ধার করব।

শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্রের এই অসম্ভব রকমের কথা শুনে আমার হাসি এলো। বললাম, একি ভদ্রতা? তোমার কাছে এসে সমস্ত সরলভাবে বলেছি বলেই কি তুমি নক্সাখানা চাইছো?

শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র একটা বিকট হেসে বললেন, ওরে হতভাগা ভেতো বাঙালী, তুই এসে বিহারের বড়বিলের গুপ্ত মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন, সোনার তাল নিয়ে পালিয়ে যাবি, আর আমি বোকার মত তাই দেখব।

না, তা হতে পারেনা। ভালোয় ভালোয় দে। নইলে আমার উদ্যত পিস্তল, তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। এই বলে সত্যি সত্যি শ্রীমিশ্র মশাই আমার কাছে এলেন।

রাত প্রায় ঘন অন্ধকার। সহসা আকাশ ফাটিয়ে গর্জন স্থরু হলো। এলো বৃষ্টি, ঝড়।

সেকি ভয়ানক দুর্যোগ—বলার নয়!

আমি হঠাৎ শ্রীসৈবাবাকে স্মরণ করে, আর রাজা হালুম বুড়োর রাজ্য থেকে চুরি করে আনা সেই মূল্যবান তরবারীটা বার করে চিৎকার করে বলে উঠলাম, বেইমান, মিরজাফর মিশ্র, আমি তোকে হত্যা করব। শুধু হত্যা নয় তারপর তোর মৃতদেহকে কুকুর দিয়ে খাওয়ার। বেইমান! এই বলে আমি ওখান থেকে সরে এলাম।

মিশ্র, সেই পিস্তলটাকে তাঁর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে নিয়ে শেষবারের মত মিষ্টি হেসে বললেন—সদা, ভাই আমার, কেন রাগ করছিস? এটা পিস্তল নয়, খেলার পিস্তল দিয়ে তোকে পরীক্ষা করছিলাম। সত্যিকারের পিস্তল হলে তোকে কুকুরের মত গুলী করে মারতাম! না, না, ভয় নেই। এই বলে সত্যি সত্যি শ্রীমিশ্র পিস্তলটা মাটির মধ্যে ফেলে দিলেন।

আমিও তরবারীটাকে কোমরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম।

তারপর যখন খুশীমনে সেই জল ঝড় বিদ্যুতের ঘন অন্ধকারের মধ্যে রাত নিঝুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীজ্ঞানদা মিশ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব ঠিক সেই মুহূর্তে'ই শ্রীমিশ্র বাঘের মত অচমকা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। তারপর পৈশাচিক অট্টহাস্য করে বললেন, ওরে বোকা, এইবার।

আমি দুই হাতে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে মিশ্রকে মাটিতে ফেলে দিলাম। সামনেই পড়েছিল পিস্তলটা।

মারামারি করতে করতে, প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে মিশ্র সেই পিস্তলটা তুলে যখন আমাকে মারতে উদ্যত হলেন আর তখনই নিমেষে আমি আমার মূল্যবান তরবারী তাঁর বুকের উপর নিক্ষেপ করলাম।



অব্যর্থ লক্ষ্য। শ্রীমিশ্র যন্ত্রণায় ছটপট করছে তবুও বেইমানটা পিস্তলটাকে ফেলে দিলো না।

শ্রীসৈবাবার কৃপায় আমি বেঁচে গেলাম। হতভাগ্য শ্রীমিশ্রকে হত্যা করে আমি নিশ্চিত হলাম। তারপর তাঁর লাসটাকে সেই গভীর ঘন অন্ধকারে এক নালার মধ্যে ফেলে দিলাম।

কেউ জানতে পারলো না। জল, ঝড়, দুর্যোগের মধ্য দিয়ে একাই চলতে সুরু করলাম। চলেছি ঝড়ের মধ্য দিয়ে, নিশানা নিয়েছি চিনে।

জয় শ্রীশ্রীসৈবাবা। পথের সব বাধা এবার বুঝি হার মানলো। নিঝুমরাতে অবশেষে সত্যি সত্যি সেই বড়বিলের মন্দিরের ভগ্নস্তুপের কাছে এলাম।

সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। একখণ্ড পাথর। আর—আর পাথরের পাশেই একটা সরু দাগ। দাগটা কিসের? সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাস সামন্তের নক্সাটা বার করলাম। আকাশে তখন বেজায় ঝড় উঠেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এ কি হঠাৎ কি হয়ে গেল সব। আমার পেছনে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে. যে সে নয় বিরাট একটা লম্বা লোক। আর তার হাতে একটা মস্ত বড় লাঠি। কী ব্যাপার? আর আমি লোকটাকে যতই ধরতে যাই, লোকটা প্রায় আমার চেয়ে ছোট হয়ে গিয়ে চমৎকার বাংলা ভাষায় বললে, চিনতে পার বন্ধু?

আমি তো শুনে অবাক! একি আমার সমস্ত পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিয়ে হতভাগ্য শ্রীজ্ঞানদাময়কে হত্যা করে নিশ্চিন্ত মনেই এখানে এসেছি। প্রায় যখন প্রবেশ করব কে এসে আমায় বাধা দেয়? কে তুমি? সেই লোকটা

যার চোখে একটা অদ্ভুত শক্তি, যার দীর্ঘ শরীর প্রায় আকাশের কাছাকাছি, যার সমস্ত কিছুই একটা অদ্ভূত! মনে মনে ভাবলাম, লালসিন্ নয় তো! হয়ত আবার এসেছে। কিন্তু আমার ভাবনাকে নিশ্চিত করেই বললে সেই দীর্ঘকায় লোকটি —ভয় নেই দাদা! আমি তোমার বন্ধু, জ্ঞানদাময়।

আমি চমকে উঠলাম। একটু আগে নিশ্চিত মনে হত্যা করে যার লাসটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। সে কি তবে মরেনি? তবে কি? মৃত্যুর ভান করেছিল?

আমি পৈশাচিক অট্টহাসিতে সমস্ত জায়গাটাকে কাঁপিয়ে আবার বলে উঠলাম, ওরে বেইমান! তোকে কুকুরের মত হত্যা করব। এই না বলেই একটা লাফ দিয়ে জ্ঞানদা মিশ্রের মাথার উপরে উঠলাম। আমাকে, কি বলব, ঠিক যেন একটা ম্যাজিসিয়ানের মত মনে হচ্ছিল! একটা অদ্ভুত লাফ দিয়ে একেবারে মাথার উপরে উঠে বসলাম।

আর জ্ঞানদা মিশ্র ভূত না অদ্ভুত, জ্যান্ত না মৃত কিছুই জানিনে। আমাকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল, একটু দূরে ঠিক সেই পাথরটার কাছে। তারপর আস্তে আস্তে বললে জ্ঞানদা, বন্ধু শোন, এসো যা পাব তা আমরা ভাগাভাগি করে ভাগ করে নি।

আমি প্রতিবাদ করে জানালাম, সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাও বলতে পারো। বললাম, ওরে বেইমান, এইবার তোর মৃত্যু নিশ্চিত। তবে আর কি? আমার সেই অব্যর্থ তরবারীটাকে যেই বার করে জ্ঞানদাকে মারতে যাব, দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দয়াময় লালসিন্।

লালসিন্‌কেও একটু আগে হত্যা করে এসেছিলাম। সে কি করে আবার উঠে এল? তবে কি ডবল হত্যা আমাকে করতে হবে? আমি একবার লালসিন্‌কে বললাম, একি ইয়ার্কি তোমার, তোমারই কথায় তোমাকে হত্যা করে এসেছি। আবার এসেছ কেন?

লালসিন্‌ একগাল হেসে বললে, —তোমারই জন্য! সান্‌সিনের হত্যার প্রতিশোধ তোমাকেই নিতে হবে। তাই মরেও আমি অমর। ভূত। ভূত বেশেই তোমাকে বলছি, বন্ধু ভয় পেওনা, এই যে আমাকে তুমি দেখছো, আমি সেই লালসিন্‌ ওরফে হীরামন পাখী! আর ঐ যে ওই পাথরের ওপর জ্ঞানদাকে দেখছো, ও জ্ঞানদা, শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্র নয়, ওকে নিশ্চিত মনে স্বর্গীয় জ্ঞানদাময় মিশ্র বলে তুমি সম্মান দিতে পারো। আমরা দু'জনেই ভূত। আমি পুরানো! আর জ্ঞানদা নতুন। কাজেই ভয় কি?

এই বলতে বলতে লালসিন্‌ মিলিয়ে গেল আকাশে। সেই নীল আকাশে মিলিয়ে যাবার আগে একবার শুধু বলে গেল, ভয় নেই সদা!

তারপর আমি স্বর্গীয় জ্ঞানদাকে বললাম, ভাই মিশ্র, কি করলে তোমার আত্মা শান্তি পাবে বলো? দেখছ না ঝড় উঠেছে, রাত এখন নিঝুম হয়ে এসেছে। এই সুযোগে যদি আমি না যেতে পারি তা হলে তো আমার যাওয়া হবে না।

আমার কথা শুনে স্বর্গীয় জ্ঞানদা মিশ্রের হয়ত দয়া হল। বললেন, সদা ভাই তুমি বাংলার গৌরব। তবে তুমি যদি সত্যিই

আমার শান্তি চাও, তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে সেই নালায় ফেলে দিয়ে এসো, আমি এবার আর বাধা দেব না।

এই না যেই বলা, আমি তার কথামত স্বর্গীয় জ্ঞানদাকে ধরতে গেলাম।

কিন্তু কোথায় স্বর্গীয় জ্ঞানদা। ছুটেছে—কি অদ্ভুত দৌড়ুতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও দৌড়াতে লাগলাম।

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে সেই নালার মধ্যে এলাম, আর স্বর্গীয় জ্ঞানদা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে বললে, বিদায় বন্ধু, বিদায় সদা!

এই বলে স্বর্গীয় জ্ঞানদা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল নালায়।

আমি আকুল ব্যথায় তাকে চিরবিদায় দিয়েই চলে এলাম। আবার সেই জীর্ণ মন্দিরের সেই রহস্যাবৃত জায়গায়।

এসে দেখলাম সেই সরু দাগ—সেই একখণ্ড পাথর। আর ভয় কি? আর ভয় নেই।

আমি সদানন্দ হালদার, আমার কথা ও কাজ এক। আমি জয়মাল্য নিয়ে আবার ফিরে যাব! জয় শ্রীশ্রীসৈবাবা। জয় হোক তোমার।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা শ্রীসৈবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে একেবারে চুপ করে গেলেন।

আশ্চর্য সদামামা, কেমন করে যে কখন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতন বশ করে এনেছিল তা নিজেরাই টের পেলাম না।

সদামামা কি যাদু জানে?

॥ ছয় ॥

সদামামার গল্প শুনতে শুনতে কখন যে এতটা সময় কেটে গেল নিজেরাই তা টের পেলাম না। বাইরের দিকে তাকালাম।

বেশ রাত হয়েছে, বিশেষতঃ একটু আগে ভয়ানক বৃষ্টি আর ঝড় হয়ে যাওয়ার জন্য সারা গ্রামটা যেন নিশ্চুপ হয়েই আছে।

গল্পের শেষ যবনিকাপাত হবে এবার, অর্থাৎ সদামামার অদেখা অচেনা সেই ভগ্নস্তূপ মন্দিরের রহস্য উদ্ধার হবে, আর আমরাও পরিত্রাণ পাব। কিন্তু সেই সদামামার আশ্চর্য নবাবী তলোয়ারটা, আর তাঁর বাঁদিকের চোখের কাটা দাগটা ?

এই সব ভাবছিলাম। কিন্তু সমস্ত ভাবনার অবসান ঘটলো সদামামার থেমে যাওয়ার ঘটনার পুনরারম্ভে।

সদামামা আবার সুরু করলেন, 'আমি তো শ্রীসৈবাবাকে স্মরণ করলাম সেই ভগ্নস্তূপ অর্থাৎ একখণ্ড পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য কী করে সেই গুপ্ত মন্দিরে প্রবেশ করব ? কোন উপায়ে ?

শ্রীনিবাস সামন্তের বিচিত্র নক্সাটাকে দেখলাম বারবার। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। উত্তেজনায় ও ভয়ে আমার সর্ব শরীর কেঁপে উঠেছে ?

একটু আগে হতভাগ্য শ্রীজ্ঞানদাময় মিশ্রকে নিজের হাতে হত্যা করেছি। তারপরেই তাঁর মৃত দেহটাকে এক নালার

মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছি। হয়ত তাঁর অভিশপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে মরছে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, একটা ছায়া দেখে। কার মুখ? জ্ঞানদা মিশ্রের না? একটু ভয় লাগল। সেই নিঝুম রাতে ভূত হয়ে আবার পিছু নিল নাকি মিশ্র মশাই?

আমি মনে মনে রাম নাম জপ করতে লাগলাম। মাথার উপরে ঘন অন্ধকার, কালো কালো মেঘে ঝড়ের সংকেত! বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বাজ ও বিদ্যুৎ উভয়ই এক সঙ্গে তাদের কাজ করে যাচ্ছে।

না, না, তবে কি সব স্বপ্ন? আমার আশা কি পূর্ণ হবে না? কি জানি কি মনে করে সেই একখণ্ড পাথরকে একবার নিজের হাতে স্পর্শ করলাম।

আশ্চর্য। সেই সঙ্গে পাথরটা হঠাৎ ওখান থেকে ছিটকে গিয়ে পাশের সরু দাগটার কাছে চলে গেল।

কী ব্যাপার? পাথরটা এতদিন পাষাণ ছিল! হয়ত আমার মত ভাগ্যবান পুরুষের স্পর্শ পেয়ে সজীব হয়ে উঠল। আমার স্পর্শ পেয়ে সে প্রাণ পেল নাকি?

ধন্য ধন্য শ্রীসৈবাবা! আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি বলেই তো শ্রীমিশ্র মশাইকে হত্যা করেছি। তার আগে হালুম বুড়োর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও আমি বেঁচে রয়েছি। না, এই গুপ্ত মন্দিরকে আমার উদ্ধার করতেই হবে।

একখণ্ড পাথর। সংকেত মিলে গেছে শ্রীনিবাস সামন্তের,

মিশ্র মশাইয়ের কথার সঙ্গে এখানকার সমস্ত বর্ণনা মিলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে।

আমি সেই সরু দাগটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সেই দাগটার ওপর একটা মস্ত বড় দেশলাইয়ের কাটি. লম্বায় প্রায় চার পাঁচ হাত হবে। কী ব্যাপার ?



হয়ত বার্মা দেশের সানসিনের আনা কোন সোনার কাঠি। সেই দেশলাইয়ের কাঠিটাকে আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম। সরু দেশলাইয়ের কাঠি লম্বায় একটা লাঠির মতন দাঁড়িয়ে রইল।

পাথরটার ওপর কাঠিটাকে ঘসে দিতেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। যেমন দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠে, তেমনি সেই জায়গাটি আলোয় আলো হয়ে উঠল।

শুধু কি তাই ? সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সরু দাগটা সরে গিয়ে একটি চমৎকার রাস্তার মতন হয়ে গেল।

আমি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। পেয়েছি, পেয়েছি পথ। কিন্তু কি হবে এর পর? না, ঠিকই চলেছি। যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি—সামনে ঘন অন্ধকার। একটুও আলো নেই। আরও এগোতে এগোতে দেখলাম একটা ছোট মন্দির!

রাত্রির ঘন অন্ধকারেও মন্দিরটার বিচিত্র কারুকার্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। হীরা, মুক্তা, পান্নার ছড়াছড়ি, আর দরজার ওপর একটা বিরাট ভীমাকৃতি দানবের চিত্র!

ছবিটা দেখে আন্দাজ করলাম, এই মন্দিরের ভয়াল দ্বাররক্ষীর প্রতিমূর্তি হয়ত। মন্দিরটার সুউচ্চ দ্বার রুদ্ধ।

হাজার হাজার বছর ধরে, কত শতাব্দী পার হয়েও সেই আদিম যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ রুস্তম আলির অমর কীর্তি এই গুপ্ত মন্দির। একদা এইখানে বার্মা থেকে আসা সানসিনের দেহটারও সমাধি এই মন্দির প্রাঙ্গণে।

কিন্তু দ্বার রুদ্ধ! আমি কি করে যাব? আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত চলে তো এসেছি এইখানে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করি কেমন করে?

নিশুতি রাতের এই অভিযান আমার মনে একটা অদ্ভুত সাহস এনে দিলো। একটা প্রচণ্ড শক্তিতে মন্দিরের দরজাটাকে ধাক্কা মারতেই দ্বার খুলে গেল, আর আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

আশ্চর্য! সামনের দিকে তাকাতেই দেখি আবার দ্বার রুদ্ধ। অর্থাৎ, অদৃষ্টের পরিহাসে আমি নিজেই নিজেকে বন্দী করলাম।

মন্দিরটার সারা ঘরে পায়চারী করছি, একটু আলো নেই, অন্ধকার! কি করব? এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম।

দেখতে পেলাম, কি একটা ঝুলছে যেন। হাত দিতেই নড়ে উঠল। চমকে উঠলাম।

দেখলাম একটা ঘণ্টা। দুলছে আর দুলছে।

আমি সেই ঘণ্টার ওপর হাত দিতেই হঠাৎ ঘণ্টাটা বেজে উঠলো, ঢং ঢং ঢং করে। কি অদ্ভুত শব্দরে বাবা! কান যেন ফেটে পড়ছে। মনে হলো থামবে না।

হঠাৎই আবার খেয়ালের ঝোঁকে সেই দোলানো ঘণ্টাকে থামিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে সারা মন্দিরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

এত আলো, এত রোশনাই কি করে হল তা আমার বুঝতে বাকী রইল না। সমস্তই বুঝি বা আমার আবির্ভাবে?

আমি সেই আলোকিত মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখলাম, কিন্তু কোথায় সেই সানুসিনের স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তি, আর হাজার হাজার বছরের মরচে পড়া গুপ্তধন, সোনার তাল?

কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘরের মাঝখানে গোলাকৃতি একটা দাগ, আর চারি দিকে তাকে বেষ্টন করে রেখেছে শক্ত সাদা সুতোর মত কি একটা জিনিষ!

আমি কৌতূহলের বশেই সেই গোলাকৃতি দাগটার ওপর পা দিতেই—দেখতে দেখতে একেবারে আরও নীচে অর্থাৎ একটা সুড়ঙ্গ ভেদ করে নীচে নেমে গেলাম।

আর সেই নীচে কি গভীর অন্ধকার। একটুও আলো নেই কোথাও।

আমার বুঝতে আর বাকী রইল না, আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেই পড়েছি, আমার আর বাঁচবার কোন পথ নেই।

চাইনে, চাইনে আমি গুপ্তধন, আর সোনার তাল। সেই ভয়াল, ভীষণ অন্ধকারে আমার পথ আটকে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রাণপণে সেই রহস্যময় সুড়ঙ্গের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে আরও তলায়।

আবার আলো! আলোয় আলোয় ছুটলাম, আমি একেবারে



সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে এসে গেছি তাহলে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল! একসঙ্গে তিনটি সুড়ঙ্গ, একের পর এক সাজানো রয়েছে যেন।

শ্রীনিবাস সামন্তের নক্সাটাকে বার করলাম। দেখলাম

ঠিকই আছে, প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয়, অর্থাৎ এইটাই শেষ। আর এইখানেই সব পাওয়া যাবে।

আমি পাগলের মত তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হায় কোথায় সেই স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তি আর সোনার তাল।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন; আর আমরা শ্রোতারা, শেষটুকু শুনবার আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি।

তারপর সদামামা বজ্রকণ্ঠে বলতে সুরু করলেন, 'সেই নির্জন গভীর রাতে আমি অসহায়ের মতন চারিদিকে তাকিয়ে রইলাম। তবে কি ফিরে যাবো? সামনে না পিছনে? হঠাৎ একটা স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম?

কার ছোঁয়া?

আশ্চর্য। কেউ নেই, আমি একাই। আবার এপাশে দিয়ে একটা হাসির কল্লোল কানে এলো!

কে হাসে?

কেউ নেই, আমি একা। আমার ভয়ে গা ছম ছম করতে লাগলো? কোন অদৃশ্য প্রেতাত্মা এই নিঝুম রাতে হাসে?

কার অদৃশ্য ছায়া আমাকে ভয় দেখায়? কার রক্তের ধারা আমার চোখে? সানসিন, লালসিন, জ্ঞানদা, রুস্তম আলি, না সবাই ছায়া—কি জানি।

নিমিষের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে বিকট অট্টহাস্য করে কে যেন আমায় বললে, 'ওরে এসেছিস তুই? কতদিন পর একটা মানুষের দেখা পেলাম।'

আমি এইখানে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়েছিলাম। তোর আসাতে জেগে উঠলাম।

ওরে আয়, ওরে আয়। এই নিঝুম রাতে আমার কাছে 'আয়, কান পেতে শোন, প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে যেন সেই অভিশপ্ত আত্মা।'

আশ্চর্য! কার কণ্ঠস্বর?

আমি সাহস করে বললাম, কে তুমি অদৃশ্য বন্ধু, আমার সামনে এসো।

কোন সাড়া এলো না! আমার তরবারীটাকে আমি হাতের মধ্যে চেপে ধরলাম। আবার সব চুপ। একটা অজানা ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে গেলো।

একটু আগে কার ছোঁয়া পেয়েছিলাম আমি? কার হাসি আমি শুনতে পেয়েছিলাম? কে বলেছিল কথা?

আশ্চর্য! সারা মন্দিরটার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ এসে গেল। তারপর ভাবলাম, না ফিরে যাই। কিন্তু যেদিকে তাকাই সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। কি করে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাব।

হঠাৎ একটা পদধ্বনি শুনতে পেলাম।

আস্তে আস্তে কে এগিয়ে আসছে? মাথায় রাজমুকুট, কটিতে তরবারি, কি বিচিত্র সুন্দর পোষাক।

কে?

সেই মূর্তিটা ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বললে, কে তুই? কেন এসেছিস? কেন? আর গুপ্ত মন্দিরে কেন এসেছিস, বল?

আমি সেই মূর্তিটাকে বললাম, আমি এসেছি সান্‌সিনের সেই স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তিকে নিতে, আর এখানকার সোনার তাল আর যা কিছু ধন-সম্পদ আছে তাই।

আমার কথা শুনে সেই মূর্তিটা অট্টহাস্য করে বললে, ওরে বোকা! আমি কে জানিস? আমি রুস্তম আলি!

একদিন এইখানে বার্মা থেকে পালিয়ে আসা সান্‌সিন্‌কে টুকরো টুকরো করে কেটে নিজের হাতে হত্যা করেছিলাম। সে আজ প্রায় কত যুগ আগের কথা! তখনও আর্য সভ্যতার আলোক আসে নি।

এই রাজ্যের রাজা ছিলাম আমি। একদিন এই মন্দির আলোকিত হয়ে উঠত, আসত দলে দলে সর্বজাতীয় নরনারীরা। কিন্তু ওরা তো ধর্ম মানলে না। এলো অরাজকতা! এলো অবিচার!

কোথাকার কে ভিনদেশী সান্‌সিন্‌ এসে এ রাজ্যকে গ্রাস করবার জন্য গোপনে ছদ্মবেশে পালিয়ে এলো ভারতবর্ষে। আর আমার ওপর তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার। আমি স্বীকার করছি সানসিনকে হত্যা করেছি। কিন্তু সেই পরম করুণাঘন বুদ্ধদেবের মূর্তিকে পবিত্র ভাবে রেখেছি।

তাইতো এমন ভাবে এ মন্দির তৈরী করেছি। কেউ আর আসেনি। আর আমি এতদিন নিশ্চিন্ত মনে এইখানে পাহারা দিচ্ছিলাম।

কেন? কেন তুই এলি? যখন তুই এসেছিস, থাক আমার কাছে। যুগের পর যুগ কেটে যাবে। কত শতাব্দী পার হয়ে যাবে—কেউ জানবে না তুই এখানে আছিস। কি মজা।

এই না বলে সেই মূর্তিটা আমার কাছে এলো, তারপর মিষ্টি হেসে বললে, ওরে আয়, কাছে আয়, কতদিন মানুষের সঙ্গ পাইনি। তুই এসেছিস--বন্ধু।

তারপর সেই মূর্তিটা হঠাৎ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বললে, একটু জল, জল দে তো! মৃত্যুর আগে সান্‌সিন্‌ জল চেয়েছিল —আমি তাকে দিইনি।

আর সেই পাপে আমিও হাজার বছর ধরে তৃষ্ণায় ছটফট করছি। কতদিন হয়ে গেলো, এলো চেঙ্গিস, এলো কালো-পাহাড়, নাদির শা। আর তোদের ইতিহাসে তৈরী হল ভয়ানক বীভৎস ইতিহাস, সত্যিকারের ইতিহাস কেউ লিখলে না।



হ্যাঁ আমি চেয়েছিলাম এইখানে সুখের রাজত্ব গড়তে। কেউ তা দিলে না। কোথা থেকে ভিনদেশী এসে ছিনিয়ে নিলে এই সোনার ভারতবর্ষ।

এই না বলে মূর্তিটা হঠাৎ মাটির মধ্যে শুয়ে ছটফট

করতে লাগলো, দে দে জল, ঐখানে যা, ঐ তো ঘড়ায় জল আছে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত যেই না ঘড়াতে হাত দিতে যাব— কিন্তু জল কোথায়? এ যে স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তি। কি সুন্দর। আমি তুলে নিতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড বাধা পেলাম!

আমার সামনে সৌম্য-শান্ত সন্ন্যাসীর বেশে একজন দাঁড়িয়ে বললে, আমি সান্‌সিন্‌, এ স্বর্ণ মূর্তি আমার প্রাপ্য। তুমি নিও না।

এই মূর্তি নিয়ে গেলে তোমার অমঙ্গল হবে। দেখছে না, যার পাপে রুস্তম আলি আজও মুক্তি পায় নি। তার বিদেহী আত্মা এখনও গুমরে গুমরে কাঁদছে।

আমিও পাপ করেছিলাম, তাই আজও মুক্তি পাইনি। আর তুমিও পাপ করেছ। এসো বন্ধু -এসো! তুমি, আমি রুস্তম আলী এই তিন হতভাগ্য এই মন্দিরে থাকি।

এই না বলে সন্ন্যাসী ছায়ামূর্তি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললে, যেওনা, যেওনা বন্ধু, কতদিন পরে একটা জ্যান্ত মানুষের দেখা পেলাম।

আমি মৃত, রুস্তম আলীও মৃত। ভয় কি তুমিও মরবে। এইখানে থাকতে থাকতে অনাহারে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে। আর একদিন আমাদের মতন তোমারও অবস্থা হবে।

এই বলে সেই সন্ন্যাসী মূর্তিটা ধীরে ধীরে সরে গেল।

আবার আমি একা। আশ্চর্য, আমার হাতে সেই স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তিটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল আর তখনই চারিদিক থেকে প্রচণ্ড হাসির কল্লোল বয়ে এলো!

আর সেই রহস্যময় মন্দিরে, সেই নিঝুম রাতে একটা অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আমি খুসীমনে ভাবলাম—তাহলে সত্যিই আমি জয়ী ?

আমার ভাবনা মিলিয়ে গেলো একটা হাসি শুনে।

কে হাসে ? সান্‌সিন ?

কে ছুটে আসছে, রুস্তম আলী ?

আর আমি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে মন্দিরের দ্বারে পড়লাম। কিন্তু এক পাও আর এগোতে পারলাম না।

মাটিতে সান্‌সিনের ছিন্নমুণ্ডু গড়াগড়ি যাচ্ছে !

মাটিতে রুস্তম আলী কাতর যন্ত্রণায় ছটফট করে বলছে, 'জল—জল !'

এই দেখে আমার বড় দয়া হল। কী করি জল কোথায় পাই ? হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আমার মৃত্যুবান তরবারিটা দিয়ে মাটির মধ্যে খুঁড়তে লাগলাম। যদি জল পাই !

কিন্তু কী আশ্চর্য ! একি এ যে সোনার তাল, অগণিত—অজস্র। একি—এ যে সোনার ছড়াছড়ি। আনন্দে উল্লাসে আমি তা কুড়িয়ে নিলাম। যত খুশী ! কেউ বাধা দিতে আসবে না আমাকে।

হঠাৎ মনে হলো সত্যি সত্যি আমি যেন সদানন্দ হালদার নই, আমি এখানকার সম্রাট !

যেই না ভাবা, কোথা থেকে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে ঝড়ের মতো সারা মন্দিরটার মধ্যে একটা ওলোট পালোট করে দিয়ে গেল।

আমার মাথা যেন ঘুরতে লাগল।

আমার হাতে সেই স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তিটা। আমি প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলাম। একটার পর একটা সুড়ঙ্গ পার হয়ে শেষ ধাপে যেন কোনক্রমে এলাম।

কিন্তু দেখি দ্বার রুদ্ধ।

চিৎকার করে উঠলাম, ওগো কে আছ আমাকে বাঁচাও, দ্বার খুলে দাও।

সেই নিঝুম রাতে একটা প্রলয় ঘটে গেল, কেউ তা জানতেও পারল না।

কেউ জানল না বাংলার ছেলে সদানন্দ হালদারের বিচিত্র অভিযানের ঘটনা।

আর আমি হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শক্তিতে সেই রুদ্ধ দ্বারটায় লাথি মারলাম। আর সেই সঙ্গে জল ঝড়ের মধ্যে যে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়লাম তা আমার মনে নেই।

এই পর্যন্ত বলে সদামামা একেবারে চুপ করে গেলেন। চশমাটাকে খুলে বাঁদিকের কাটা দাগটাতে দু'বার সযত্নে হাত বুলোলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম কী মারাত্মক সেই দাগটা!

তারপর?

তারপর সদামামা আবার নাটকীয় ভঙ্গীতে শেষটুকু বলতে আরম্ভ করলেন, যখন জ্ঞান হলো, চেয়ে দেখি আমি আগের জায়গায় এসেছি, অর্থাৎ বড়বিলের সেই একখণ্ড পাথরের কাছটায়।

দেখি সকাল হয়ে গেছে। অনেক লোক এদিকে আসছে আমাকে দেখতে পেয়ে নাকি? না হতভাগ্য স্বর্গীয় জ্ঞানদা মিশ্রের হত্যাকারীকে খুঁজছে ওরা?

আমাকে দেখতে পেয়েই ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠলেন, কে মশাই আপনি? অজানা এই গ্রামে এসেছেন? কি মনে করে? জানেন গতকাল থেকে শ্রীজ্ঞানদা মিশ্র মশাইকে পাওয়া যাচ্ছে না? তাঁর লাশটা একটা নালার মধ্যে ভেসে উঠেছে!

আমি সব কথা শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, তার জন্যে আমায় এত বলছেন কেন? আমি এসেছি এখানে বেড়াতে? ডাঙ্গোয়া-পোষী থেকে সোজা পদব্রজে এসেছি। শুনেছিলাম বড়বিলের সেই অভিশপ্ত জীর্ণ মন্দিরটার কথা।



আমার কথা শুনে কে একজন বলে উঠলেন, কি মশাই, গাঁজা দেবার জায়গা পাননি? বড়বিলের মন্দির? আমাদের সাত পুরুষ এখানে, একটা মন্দির তো দূরের কথা—একটা মসজিদও নেই এখানে।

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, আছে আছে, এই দেখুন তার

প্রমাণ ? এই দেখুন সেই মন্দিরের আশ্চর্য্য বিচিত্র নক্সা ! এই দেখুন সেই স্বর্ণ বুদ্ধমূর্তি ?

আমার কথা শুনে হো হো করে সবাই হেসে উঠল। ওদের মধ্যে একজন বললেন, একটা সাদা কাগজকে নক্সা বলছেন ? আর একটা মাটির মূর্তিকে স্বর্ণ মূর্তি ? কি মশাই আপনি পাগল নাকি ?

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলেন, কি মশাই আপনি তো শ্রীমিশ্রকে হত্যা করেননি ?

আমি সত্যিই চমকে উঠলাম। আমিই সেই হত্যাকারী যদি ওর টের পায়। অগত্যা আমি প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলাম, আমার পেছনে পেছনে অগণিত লোক।

শুধু কি তাই, নেপথ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'সদা ! সদা ! শোন !' কে ডাকে ? কে ? তবে কি আমার বন্ধুরা !

আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি পরম জ্ঞানী শ্রীসৈবাবা, না সেই মহাপাগল শ্রীনিবাস সামন্ত, না রাজা হালুম বুড়ো ! না কেউ নয় ! তবে কে ডাকে আমায় ? আমার নামে আর কেউ আছে নাকি ?

আবার দৌড়াতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গভীর নালার মধ্যে পড়ে গেলাম। সেখানে দেখি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে চিরনিদ্রায় স্বর্গীয় জ্ঞানদাময় মিশ্র। তাকেই জড়িয়ে ধরলাম, একেবারে জড়াজড়ি। তারপর গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে, নীচে আরও নীচে।

তারপর, তারপর মনে পড়ছে না ! কি বলছি ? রাত তো অনেক হল, বড় ঘুম আসছে। রাত নিঝুম হয়ে আসছে নাকি ?

কি বলছিলাম আগে ? কতদূর পর্যন্ত বলেছি তোমাদের ? সেই নবাবী আমলের তরবারী ? রাত নিঝুম হলে ! তা হলে ? এই কাটা দাগটা ?

হ্যাঁ বলছি শ্রীশ্রীসৈবাবার জ্যান্ত লোহার ডাণ্ডাতে খতম হয়েছে—না, না, ঠিক তা নয় ! সেই সিংহটাকে খতম করতে—না, ঠিক তা নয়, সেই যে মাষ্টার মশায়ের বেত খেতে গিয়ে । —না, না ।

এই পর্য্যন্ত বলে সদামামা চুপ করে গেলেন ।

আমরা এতক্ষণ সদামামার এই সব অলৌকিক গল্প শুনছিলাম । কিন্তু যাই হোক গল্পের খাতিরে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে । সত্যিকারের জীবনের ঘটনা হলে আমাদের আপত্তি আছে ।

সদামামা একটা মস্ত বড় খাতা বার করে কি যেন একবার লিখলেন । তারপর ঘড়িতে যখন রাত প্রায় এগারোটা বাজে, আমরা সবাই প্রায় চমকে উঠলাম । সেই বিকেল থেকে রাত এরাগোটা পর্যন্ত সদামামা আমাদের আটকে রেখেছিলেন । কিন্তু সেই নবাবী আমলের তররারীটা দেখতে পেলাম না এখনও ?

সদামামা বললেন, রাত তো অনেক হয়ে এলো, আরও দু'তিন ঘণ্টার পর তোমাদের অর্থাৎ রাত দুটোর সময় নবাবী আমলের তলোয়ারটা দেখাতে পারব ।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, না সদামামা, এখনই দেখান যেমন করে হোক !

আমাদের মধ্যে কানাই ভয়ে ভয়ে বললে, না মামা দরকার নেই।

কিন্তু সদামামার মুখে কী প্রসন্ন হাসি!

তারপর খাতার মধ্য থেকে ছোট্ট একটা তরবারী বার করে নিয়ে সদামামা যাত্রাদলের অধিকারীর মতন, সারাঘর পায়চারী করতে করতে বললেন, ভয় পাবে না তোমরা?

আমি হেসে বললাম! না মামা ভয় কেন পাব? আপনি বলুন।

'বলছি' এই না বলে মামা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। সেই পুরাণো ঘটনার জের তুলে নিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলতে সুরু করলেন। তাঁর বলার আগে লক্ষ্য করলাম মামার চোখে জল।

কিন্তু কেন?

মামা এক চোখে হাসি, আর এক চোখে জল নিয়ে বলতে সুরু করলেন, 'অপরাধ নিওনা বৎস! এর আগে তোমাদের আমি জানিয়েছি আমার জীবনের বিচিত্র ঘটনা! আর এই তলোয়ার কোথা থেকে পেয়েছি জানো?'

কোথা থেকে? বললে রজত।

মামা বললেন, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে দৈত্যরাজ মিশরের টমটমের কাছ থেকে পাওয়া এই তলোয়ার। আমি যখন মিশরে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখনকার সময়েই। জানোতো ইতিহাসের প্রতি আমার প্রবল ঝোঁক। আর এই ইতিহাসই—

বলতে বলতে সদামামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর আবার বললেন, মিশরের দৈত্যরাজ টমটম যখন তাঁর রাজসভায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখনকার সময়েই মোগল বংশের শেষ বংশধরের শেষ খানের তরবারিটা রাজসভায় টাঙানো ছিল।

আমি দৈত্যরাজ্য টমটমের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম।

দৈত্যরাজ টমটম খুশি হয়ে বললেন, 'নিয়ে যা সদা, নিয়ে যা।'

আমার কিন্তু আর ভাল লাগছিলো না, সদামামার এই অর্থহীন কথা শুনে।

কিন্তু সদামামাই তাল হারিয়ে বেতালভাবে বলতে স্বরু করলেন, সেই মোগল সাম্রাজ্যের শেষ নবাবের বংশধর শেষ খানের সময়ে, তখনকার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক ফিরিঙ্গি সাহেবকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এই তলোয়ার তোমাকে দিলাম। আর সেই তলোয়ার যুগ থেকে যুগে, ঘুরে ফিরে এসে মিশরের দৈত্যরাজ টমটম আমায় উপহার দিয়েছিলেন।

এই না বলে সদামামা সত্যি সত্যি নিজেই তলোয়ারটাকে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন।

শুধু কি ঘোরালেন, না মনের আনন্দে বলে উঠলেন কি মজার এই তলোয়ার। যার হাতে যাবে সেই বুঝবে—

আমাদের মধ্যে থেকে সাহস করে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, দিন মামা আমার হাতে।

আমাদের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যে ভীরু সেই কানাইয়ের হাতে গিয়ে পড়লো সেই তরবারীটা।

আর যেই না পড়া কানাই চিৎকার করে বললে, নট্ট কোম্পানির অভিনেতা শ্রীসদানন্দ হালদার।

আর আমি প্রায় রেগেই বলে উঠলাম, কি আশ্চর্য এতো যাত্রা দলের তলোয়ার।

এ কথা শুনে সদামামা হাসলেন।

কিন্তু একবারই।

তারপর সদামামা, সারা ঘরে পায়চারী করতে করতে নাটকের মত করে বলতে সুরু করলেন, কেউ বুঝবে না, কেউ জানবে না. দীন দরিদ্র সাহিত্যিকের মর্ম বেদনা!

আমার এত লেখা কেউ ছাপায় না! বুঝেছি সাহিত্যিক হতে হলে চাই বিরাট প্রাসাদ, প্রচুর—অর্থ। না, না. আমি সাহিত্য সাধনা করব না। আমি যুদ্ধ করব—কার সঙ্গে, নিজের সঙ্গে।

এই না বলে মামা সেই তরবারীটাকে নিজের হাতে নিয়ে নবাব সিরাজের মত বললেন, একদিন—সেই জল ঝড়...

হঠাৎ সদামামার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেলো। বলা আর হল না।

ঠিক সেই সময়েই রজতের মা ঘরে এলেন।

আমাদের বললেন, সদা পাগলের পাল্লায় তোমরা পড়েছ বুঝি? কি সব আজগুবি গল্প লিখতে পারে—যাও তোমরা বাড়ী যাও।

আমরা উঠবার জন্য তৈরী হয়েছিলাম।

কিন্তু সদামামার হাসিতে আবার পিছন ফিরে তাকালাম।

সদামামা প্রাণখোলা হাসিতে বলে উঠলেন, বলোনা দিদি ভাগ্নেদের পেয়ে চমৎকার গল্প মুখে মুখেই বলে দিলাম।

আর আমরা ?

সদামামার এই কথা শুনে তখনই ঘর থেকে সোজা চলে এলাম।

বাইরে তখন বেশ অন্ধকার!

আর সেই সঙ্গে চমৎকার হাওয়াও দেখা দিয়েছে।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি চলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে থেকে যে ধীর অর্থাৎ সুধীর সে বললে, সদামামার গল্পটার কি নাম দেওয়া যায় বলতে পারিস ?

আমার মুখ দিয়ে জবাব এলো তখনি, বললাম—সদামামার অভিযান।

সমাপ্ত

সে ২